স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৮ম বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ ডিসেম্বর ২০১৮-জানুয়ারি ২০১৯

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ডা. কুশল সেন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা.অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা.আশীষ কুমার কুণ্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা.দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা.শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা.সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ মনোজ দে, গোপাল সরকার,
ডা. কুশল সেন,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

‘রিস্তেমেঁ তো হম তুমহারা বাপ লাগতা হ্যায় . . .’

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের এক-তৃতীয়াংশ রোগী সেরে যান, এক-তৃতীয়াংশ রোগী মোটামুটি জীবন যাপন করেন আর বাকিদের কিছুই করা যায় না। আত্মহত্যা করেন ১০-১৫% রোগী। রোগটা নিয়ে গল্পের ছলে বলেছেন— **ডা. সুমিত দাশ**।

৪

থ্যালাসেমিয়া নিয়ে

থ্যালাসেমিয়া হলে সারানো যায় না, কিন্তু থ্যালাসেমিয়া হওয়া আটকানো যায়। লিখেছেন—ডা. কাঞ্চন মুখার্জী

১৩

হাঁটু বদল বা নি-রিপ্লেসমেন্ট

নি-রিপ্লেসমেন্ট দিনের পর দিন বেশি বেশি করে করা হচ্ছে। প্রধানত হাঁটুর অস্টিয়োআর্থ্রাইটিসের জন্য করা হলেও অন্য কিছু রোগেও এই অপারেশন করা যেতে পারে। এই অপারেশনের আবার রকমভেদ রয়েছে। এন এইচ এস-এর প্রচারসামগ্রী অবলম্বনে লিখেছেন— **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

১৫

কুঁড়ে চোখ বা একচোখোমি

লেজ়ি আই বা অলস চোখ হল সেই চোখটি, যার পাঠানো ছবি মস্তিষ্ক গ্রহণ করছে না। এমনটা কোনো কারণ ছাড়া হলে রোগটার নাম দেওয়া হয় অ্যামব্লায়োপিয়া। আমাদের দুটো চোখ আছে বলে অনেক সময় বুঝতে দেরি হয়ে যায় যে একটা চোখ কমজোরি—লিখেছেন **ডা. দীপংকর জানা**।

১৯

দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা প্রসঙ্গে কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা

৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ উচ্চতম ন্যায়ালয় জানিয়ে দিল দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। দু-জনের সম্মতি থাকলে সমকাম আর অপরাধ নয়। ন্যায়ালয়ের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন **ডা. বিষাণ বসু**।

২২

রোগীর শুশ্রূষা

রোগীর রোগের চিকিৎসায় ডাক্তার প্রেসক্রিপশন করলেন, হয়তো-বা অপারেশন করলেন, কিন্তু রোগীকে সারিয়ে তুলতে অনন্য ভূমিকা শুশ্রূষাকারীর। যে রোগী কখনো সেরে উঠবেন না, তাঁর কষ্ট লাঘব করার কাজেও ব্রতী শুশ্রূষাকারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারী রোগীরই পরিজন। রোগীর চেয়ে তাঁর শুশ্রূষাকারীর সমস্যা কম নয়। অনেক দেশে রোগী ও তাঁর শুশ্রূষাকারীর যত্ন নেয় ‘হসপিস’ নামের এক ব্যবস্থা। লিখেছেন—**ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত** এবং **পিয়ালী দে বিশ্বাস**।

৩২ ও ৩৪

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৩
‘রিস্তেমেঁ তো হম তুমহারা বাপ লাগতা হ্যায় . . .’	ডা. সুমিত দাশ	৪
ভয়	ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত	৬
ব্যালানাইটিস বা লিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহ	ডা. জয়ন্ত দাস	৯
স্ক্রাব টাইফাস	ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা	১২
থ্যালাসেমিয়া একটি মারণরোগ— এর প্রতিরোধ সম্ভব	ডা. কাঞ্চন মুখার্জী	১৩
হাঁটু বদল বা নি-রিপ্লেসমেন্ট	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	১৫
অসহ্য দাঁতের যন্ত্রণা!! ডাক্তারবাবু দাঁত তুলে দিন !!	ডা. মনজুরুল ইসলাম	১৭
কুঁড়ে চোখ বা একচোখোমি	ডা. দীপংকর জানা	১৯
দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা প্রসঙ্গে কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা	ডা. বিষাণ বসু	২২
কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে	**মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন**	২৬
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	২৭
কেয়ার গিভার-শুশ্রূষাকারী	ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত	৩২
সন্তান সান্নিধ্যে সুস্থতার আশায় জীবন্মৃতকে চিকিৎসা সহায়তা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছেন ডাক্তার	পিয়ালী দে বিশ্বাস	৩৪
এখনই ভালোবাসা যায়	ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা	৩৭
নিরীহাসুরের “মহা” সপ্তমী	ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত	৩৮
শুভ দুর্গোৎসব	ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক	৪০
পেঁপে পাতা	ডা. অনুপ বৈরাগী	৪২
বই পড়া: সত্যি হলেই গল্প হয়	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	৪৪
টুকরো খবর:		
ভারতে কুষ্ঠ বাড়ছে		৪৬
ইউনাইটেড নেশনসের রিপোর্ট বলছে, ভারতে নবজাতকের মৃত্যুর হার কমেছে, কমেছে কন্যা-শিশু মৃত্যুর হারও		৪৬
পি সি-পি এন ডি টি আইনে নতুন পরিবর্তন: আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে পারবেন এবার আয়ুর্বেদ-সিদ্ধা-উনানী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা?		৪৭
নির্বাচিত মেডিক্যাল কাউন্সিলের স্থান নিল কেন্দ্র সরকার গঠিত বোর্ড অব গভর্নরস		৪৭
অ্যান্টিবায়োটিকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে সাবধান		৪৯
হরেকরকম:		
ছারপোকা		৪৮
অনিচ্ছাকৃত ওজন হ্রাস		৫০
চিঠি: পাঠকের পত্র: লেখক ও অন্য এক চিকিৎসকের উত্তর		৫১

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলে-র স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ফোন ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭
ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

স্বাস্থ্যের বৃত্তের গ্রাহক হোন।
সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।
Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFS Code: CNRB0000315
সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ও সেগুলি থেকে মৃত্যুর হার কমছে। বেড়ে চলেছে মানুষের আয়ু এবং তার পাশাপাশি অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব—হার্ট ও রক্তনালীর রোগ, ডায়াবেটিস মেলিটাস, ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ পালমোনারি ডিজিজ় এবং ক্যান্সার। অসংক্রামক রোগগুলি থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুক্তি মেলে না। অনেক সময় শেষ সময়গুলি হয় অতীব যন্ত্রণাদায়ক।

হাসপাতালে বেডের সংখ্যা সীমিত, মৃত্যুপথযাত্রী এই রোগীদের বেশির ভাগেরই সেখানে জায়গা মেলে না। বাড়িতে তাঁদের রাখলে পরিবার-পরিজনের দুর্গতির সীমা থাকে না।

পৃথিবীর অনেক দেশে অবস্থাটা এমন নয়, সেখানে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের আরাম দেওয়ার জন্য, শারীরিক-মানসিক-আধ্যাত্মিক কষ্ট লাঘব করার জন্য এবং তাঁদের মর্যাদা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার নাম হসপিস। ক্লান্ত পথিকদের আশ্রয়স্থল 'হসপেস' শব্দ থেকে হসপিসের উৎপত্তি।

হসপিস কোনো স্থান নয়, যত্নের এক আদর্শ। হসপিস কেয়ার দেওয়া যায় হাসপাতালে, নার্সিং হোমে বা রোগীর বাড়িতে। হসপিস টিমে থাকেন চিকিৎসক, নার্স, স্বেচ্ছাসেবক, কখনো ধর্মগুরুও। রোগীর চিকিৎসার পাশাপাশি তাঁর সংসারের দৈনন্দিন কাজে সহায়তা, অপূর্ণ আইনি বা অর্থনৈতিক বিষয়ে সাহায্য, অন্তিম ক্রিয়াকর্মের ব্যবস্থা—এই সবও হসপিস যত্নের আওতায়। কেবল রোগী নন, রোগীর যত্ন নিচ্ছেন যাঁরা, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁদেরও খেয়াল রাখে এই ব্যবস্থা। এমনকী তাঁদের ক্লান্তি থেকে মুক্তি দেওয়ারও বন্দোবস্ত করে।

ভারতে হসপিস ব্যবস্থা আছে গুটিকয়েক জায়গায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়, প্রয়োজনের তুলনায় একান্তই নগণ্য।

আমরা সরকারি ব্যবস্থাপনায় 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'-এর পাশাপাশি অন্তিম পথযাত্রীদের জন্য হসপিস ব্যবস্থাও চাই।

‘রিস্তেমেঁ তো হম তুমহারা বাপ লাগতা হ্যায় . . .’

ডা. সুমিত দাশ

‘. . . নাম শাহেনশা। আগর কিসিনে হিলনেকা কোশিস কি তো ভুন্দ কে রাখ দুঙ্গা।’ ‘পিটার তুম মুঝে ঢুঁড়তে হো অউর ম্যায় তেরা ইন্তেজ়ার ইঁহা কর রহা হ্যায়।’ উশকোখুশকো চুল, না কামানো দাড়ি, অপরিষ্কার ঢ্যাঙা লোকটা একটার পর একটা অমিতাভ বচ্চনের ডায়লগ বলে যাচ্ছে। স্থান—আর. জি. কর. মেডিক্যাল কলেজের সাইকিয়াট্রি আউটডোর, কাল—তা প্রায় ২১-২২ বছর আগের তো হবেই।

জমা করেছে দলা পাকানো, ছেড়াখোঁড়া, দাগ ধরা এক গোছা টিকিট। দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলাম

—আপনার সমস্যাটা কী?

—সমস্যা ভাবলে সমস্যা, আর না ভাবলে না।

—তার মানে?

—শুনুন ডাক্তারবাবু আমি হচ্ছি অমিতাভ বচ্চনের ফ্যান। দেখুন চেহারায়ও মিল আছে। তাকিয়ে দেখলাম হাইটটা সত্যি ছয় ফুটের মতোই হবে। কিন্তু অপুষ্টিতে ভোগা, তোবড়ানো গাল চেহারার সঙ্গে সে যুগের বলিউডের একচ্ছত্র সম্রাট ‘শাহেনশা’র মিলটা কলকাতা থেকে বম্বের—তখনও মুম্বাই হয়নি—দূরত্বের মতোই।

হাসি চেপে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলাম—ফ্যান তো বুঝলাম তা এখানে কেন এসেছেন? সঙ্গে কে এসেছেন?

—সঙ্গে কেউ নেই। আর কেন এসেছি সেটাই তো বলতে যাচ্ছি। আপনি তো আটকে দিচ্ছেন। কথাটা হচ্ছে কী, আমি যখন হাঁটি ‘গুরু’ আমার সামনে সামনে হাঁটে।

—কী রকম?

—‘দীওয়ারে অমিতাভ’ সেই নীল রঙের লম্বা জামাটা পরা। সামনে গিঁট বাঁধা। হাতে একটা রিভলভার।

সোমবারের সাইকিয়াট্রি আউটডোর তখন ভিড়ে ভিড়াক্কার, ডাক্তারদের বিভিন্ন টেবিলে লম্বা লাইন। কিছু মানুষ বেঞ্চে গাদাগাদি করে বসে আছে। চিৎকার চেঁচামেচি। যেহেতু সাইকিয়াট্রি আউটডোর—কেউ কাঁদছে, কেউ ভাবলেশহীন, কেউ বিড়বিড় করছে, কোথাও উত্তেজিত রোগীকে বাড়ির লোক চেপেচুপে সামলাচ্ছে। কেউ-বা এক রাশ বিষাদ মেখে দাঁড়িয়ে আছে। পাঠ্য বইয়ের জীবন্ত চরিত্ররা যেন এসে ভিড় করেছে।

আমি আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে দেখলাম লোকটা আপন মনে বিড়বিড় করছে। বললাম—কী হল? ‘গুরু’ কি এই ভিড়ে এসেছে নাকি?

—নাহ! আসেনি। তবে কানে কানে কী একটা বলল যেন।

আপাতত অমিতাভ বচ্চন-কে দূরে রেখে দু-একটা কথা বলে নিই। আমরা রূপ-রস-গন্ধে ভরা এই পৃথিবীকে অনুভব করি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ ছোটোবেলায় পড়া সেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এদের মাধ্যমে। আর এই প্রত্যেকটা অনুভূতির জন্যে লাগে একটা স্টিমুলাস (Stimulus) বা উদ্দীপনা। যেমন কেউ কথা বললে সেই উদ্দীপনা কানের মধ্যে দিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে শব্দের অনুভূতি তৈরি করে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু উদ্দীপনা ছাড়া যে অনুভূতি তাকে বলা হয় হ্যালুসিনেশন (Hallucination) বা অলীক অনুভূতি। যেটা এই ভদ্রলোকের হচ্ছে দর্শন এবং শ্রবণ অলীক অনুভূতি। স্কিজোফ্রেনিয়া। বড়ো অদ্ভুত রোগ এই স্কিজোফ্রেনিয়া।

একমাস বাদে আবার দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম

—কেমন আছেন?

—খুব ভালো।

উশকোখুশকো স্নান না করা চেহারা, খাওয়া-দাওয়া ঠিকঠাক হয় না। কিন্তু এই রোগীদের বোঝার ক্ষমতা থাকে না সে খারাপ আছে।

অলীক অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে কারোর কারোর ভ্রান্তি বা ডেলিউশান (Delusion) থাকে। অর্থাৎ একটা দৃঢ়, কিন্তু ভুল বিশ্বাস যেটা যুক্তি দিয়ে রোগীকে ভুল প্রমাণ করা যাবে না। যেমন কারোর মনে হয় কিছু লোক তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তার ক্ষতি করার জন্যে, কেউ ভাবে পুলিশ এসে তাকে ধরবে, কেউ তার স্বামী বা স্ত্রী-কে সন্দেহ করে অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে। কেউ ভাবে তার কথা রেডিয়ো, টিভিতে আলোচনা হচ্ছে ইত্যাদি। যেহেতু তার চিন্তার জগৎ গোলমাল হয়ে যায় সে উলটোপালটা কথা বলে বা অস্বাভাবিক আচরণ করে। কারোর বা নেতিবাচক উপসর্গ আসে—অর্থাৎ কথা বলে না, কাজ করে না, খাওয়া-দাওয়া করে না।

তারপর লোকটা হাওয়া। আমি নিজে যেহেতু সে যুগের অমিতাভের (মানে সেই শোলে, দীওয়ার, জঞ্জীর-এর অমিতাভ বচ্চন-এর, এই মুখে অদ্ভুত দাড়ি রাখা নবরত্ন তেলের অ্যাড দেওয়া শ্রীমান ভূতনাথের নয়) অন্ধ ভক্ত ছিলাম তাই নজর রাখতাম লোকটা এল কিনা। এল প্রায় মাস চারেক বাদে। চেহারা আরও খারাপ হয়েছে, মুখে একটা অস্বাভাবিক হাসি। বোঝাই যাচ্ছে ওষুধ খাচ্ছে না।

ততদিনে একটা সখ্য তৈরি হওয়ায় তুমি করে বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছো?

হো হো করে হেসে উঠল যেন খুব মজার কথা। এটা ওটা রোগ সম্পর্কিত কথা দু-একটা জেনে নিয়ে আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরলাম। বললাম—

—আচ্ছা বলো তো কোন সিনেমায় অমিতাভ প্লেটে করে চা খাচ্ছিল?

—শোলের কথা বলছ তো। দীওয়ারেও একইভাবে চা খেয়েছে। এছাড়া বেমিশাল, অনুসন্ধান আরও অনেক সিনেমায় কাপে চা খেয়েছে। ফালতু প্রশ্ন কোরো না। দেখ ডাক্তার অমিতাভকে আমার সামনে থেকে সরানো তোমার কম্ম নয়। দুটো টাকা দাও চা খেয়ে চলে যাই।

প্রেসক্রিপশান লিখতে লিখতে মাথা নীচু করে ভাবছিলাম স্কিজোফ্রেনিয়ায় স্মৃতিশক্তি লোপ পায় না কথাটা একদম ঠিক। কেমন অবলীলায় চা খাওয়ার সিন বলে গেল। আর এই এত শক্তিশালী হ্যালুসিনেশানের এত দিনের রোগকে কী-বা করা ! এই রোগে এক-তৃতীয়াংশ রোগী সেরে যায়, এক-তৃতীয়াংশ মোটামুটি জীবন যাপন করে আর এক-তৃতীয়াংশ রোগীকে সত্যিই কিছুই করা যায় না। আর দুর্ভাগ্যজনক হল ১০-১৫ শতাংশ রোগী আত্মহত্যা করে। প্রেসক্রিপশান লিখে হতাশভাবে তাকিয়ে দেখলাম লোকটা বিড়বিড় করছে। ডাকতে সম্বিত ফিরে তাকাল। দুটো টাকা দিলাম, নীরবে চলে গেল।

তারপর আরও প্রায় বছর দেড়েক ছিলাম। আউটডোর করতাম। কিন্তু কখনো আর ঢ্যাঙা লোকটাকে দেখিনি। জানি না ও তখনও 'দীওয়ার'-এর অমিতাভের পেছনে হাঁটছিল কিনা। নাকি হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে একদিন জীবনের পথে হঠাৎ দাঁড়ি টেনে দিয়েছিল।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সুমিত দাশ, সাইকিয়াট্রিস্ট, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

একক মাত্রা Advt.
গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা: ১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬/৯৮৩০৪৯৩২৩৯

ভয়

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত

প্রাক্‌কথন ১

সময়টা, উনিশ শতকের এক্কেবারে গোড়ার দিকে। ইংল্যান্ডে তখনও শিল্প বিপ্লব হয়নি। মস্ত মস্ত চোঙা টুপি এবং লম্বা লম্বা ছড়ি হাতে সাহেবসুবোরা ঘুরে বেড়ান পাথুরে রাস্তায়। বলিষ্ঠ ওয়েলার ঘোড়া টেনে নিয়ে যায় দু-চাকার কেবিন। সহিসের চাবুক চলে সপাসপ। বন্ধ দরজা কেবিনের ভেতরে, থুতনিখানা ঈষৎ উঁচু রেখে বসে থাকেন বিত্তবান পুরুষ। পাশে তাঁদের কালচে হাতমোজা পরিহিত নারী। গ্যাসের আলো জ্বলে প্রায় সর্বত্রই। কেঠো দরজাওয়ালা পাব-এ, হাতে হাতে চলকায় ফেনা-ওঠা বিয়ার। চার্চের প্রভাব প্রভূত। কথায় কথায় "সাইন অফ ক্রশ" আঁকা হয় হাওয়াতে। উপকথা, ডাইনিবিদ্যা, নেকড়েমানুষ এবং রক্তচোষার গপ্পো, তুফান তোলে সান্ধ্য ডিনারে।

ঠিক এইরকম একটা সময়ে বড়ো আজব ঘটনা লক্ষ করা গেল। ইংল্যান্ডের বেশ কিছু বাড়িতে, অদ্ভুত রকমভাবে মারা গেলেন একের পর এক গৃহসদস্য। বাড়িগুলি কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। আপাতভাবে কোনোরকম মিলই নেই একটি বাড়ির সাথে অপর বাড়ির।

কিন্তু তবুও, মৃত্যুলীলার প্যাটার্নটা মোটামুটিভাবে একরকম। প্রথমে যেকোনো একজন সদস্য আক্রান্ত হবেন। শুকিয়ে যাবেন একটু একটু করে। কোটরে ঢুকে যাবে চোখ। বুকে জুড়ে উঁচু হবে হাড়-পাঁজরা। খিদে উধাও হবে। শরীরে ঈষৎ বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। এবং একটা সময় মানুষটি মারা পড়বেন শয্যাশায়ী অবস্থাতেই।

ব্যস। ওটাই শুরুর সংকেত। এরপর, একের পর এক, একের পর এক করে করে আক্রান্ত হবেন, বাকি সদস্যরাও। চোখে মুখে রক্তাল্পতার ছাপ সুস্পষ্ট। ধীরে ধীরে, কবরে স্থান হবে প্রত্যেকেরই। একটা বিশাল জায়গা জুড়ে, পর পর শায়িত থাকবে, একটা গোটা পরিবারের কফিন সম্ভার।

ভ্যাম্পায়ার! রক্তচোষা!!

সমগ্র ইংল্যান্ড তো বটেই, ফ্রান্সেও বিয়ার মগে তুফান তুলল এই ঘটনাগুলো—ভ্যাম্পায়ারের অকাট্য প্রমাণ।

প্রাক্‌কথন ২

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ। বিজ্ঞানী সেলম্যান ওয়াক্সম্যান আবিষ্কার করলেন, শতাব্দী-প্রাচীন "ভ্যাম্পায়ার" রোগের ঔষধ। আশায় বুক বাঁধল সারা পৃথিবী। এবং সেই আশার সমস্তটাই বিলুপ্ত হল বছর খানিক বাদেই। ভ্যাম্পায়াররা অত সহজে হারতে জানে না।

আসল গল্প, অজ্জিনাল কেস

রোগ যে একটা কিছু আছে, সেটা বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করে আসছিলেন অনেক বছর ধরেই। এমনকী হিপোক্রেটিসও। হিপোক্রেটিস এ রোগের নাম দিয়েছিলেন থাইসিস। ভক্ষণ। এমন একটা রোগ, যা খেয়ে ফেলে শরীরকে একটু একটু করে।

সময়ের চাকা গড়াল। বিজ্ঞানও হল আরও জোরালো। কিন্তু এই অজানা বিভীষিকাটির কার্যকারণ ব্যাখ্যাতীতই থেকে গেল। ১৬০০ সাল নাগাদ, দুই-এক জন আমতা আমতা করে বললেন বটে—"রোগটা আদতে ফুসফুস থেকে হয়", কিন্তু প্রমাণ দিতে পারলেন না সেভাবে। জল্পনা বাড়ল আরও। বাড়ল—ভীতি। বাড়ল—গুজব। যার সবচাইতে বড়ো প্রমাণ—ভ্যাম্পায়ার প্রসঙ্গ। এইসব যখন চলছে, তখন, এই ধরুন ১৮৩৯-৪০ হবে, জোহান লুকাস নামক এক বিজ্ঞানী, রোগটির নামকরণ করলেন। টিউবারকিউলোসিস। যক্ষ্মা।

রোগটির সঠিক উৎস যদিও তখনও অজানাই পুরোটা। অজানাই রইল আরও চল্লিশটা বছর। যদ্দিন না জার্মান বিজ্ঞানী হেইনরিখ হেরম্যান রবার্ট কক, অণুবীক্ষণ যন্তরের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন টিবি জীবাণুর অস্তিত্ব। মাঝখানের এই চল্লিশ বছরে অবশ্য ঘটে গেছে ভয়ানক সব তামাশা। রোগ সারানোর নামে হাবড়ি-জাবড়ি এক্সপিরিমেন্ট।

১৮৪০ নাগাদ, জন ক্রোগহ্যান নামক এক সাহেব, কেন্টাকি শহরের এক গুহাতে বন্দি করে রাখলেন বেশ কিছু "যক্ষ্মা" রোগীকে। গুহাটির নাম ম্যামথ গুহা। সমগ্র বিশ্বের দীর্ঘতম গুহা এটি। উদ্দেশ্য একটাই। জনসমাজ থেকে দূরে, এবং গুহার উষ্ণ তাপমাত্রায়, ক্রোগহ্যান, সারিয়ে তুলবেন রোগীদের। ফল হয়েছিল ভয়াবহ। এক বছরের মধ্যে মারা গিছলেন প্রত্যেকটি রোগী। ততদিনে, এ রোগের প্রকোপ ধরা পড়তে শুরু করেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এখানে ওখানে এবং সেখানে। এমনকী, আঙ্কেল স্যামের 'মেরিকা'-তেও। দলে দলে, পিলে পিলে, মারা যেতে শুরু করেছে রোগী। রোগ ওই একটাই—টিউবারকিউলোসিস।

নতুন ধারণার জন্ম হল। "ওদের পাহাড়ের মুক্তবায়ু সেবন করাও। ওদের রোদ্দুরে সেঁকে দাও। ওদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করো . . . তবেই রোগ সারবে।" পাহাড়ের কোল ঘেঁষে তৈরি হল টিবি স্যানেটোরিয়াম। যাঁদের পয়সা আছে, তাঁদের পরিবারের রোগীরা ভর্তির সুযোগ পেল সেইখানে। বিদেশ এবং স্বদেশে নতুন টার্ম আবিষ্কার হল—হাওয়াবদল।

আর যাঁদের পয়সা নেই? যাঁদের নেই আশেপাশে কোনো পাহাড়? তাঁরা দলে দলে, ছেলে কোলে, ভিড় জমালেন এসব হাসপাতালের আশেপাশের ফুটপাথে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও, উনিশ শতকের মাঝামাঝি, ডেনভার শহরের অলিতে গলিতে পার্কে রাস্তায় যেসব মানুষ ছুটে ছুটে গিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ ডেনভারের বিশ্বখ্যাত গোল্ডরাশ বা স্বর্ণসন্ধান-এ যাননি। গিয়েছিলেন জীবিত থাকার লোভে। পারেননি। মরে গিয়েছিলেন পথেই। ঠিক যেইভাবে মরে গিয়েছিলেন, অধিকাংশ স্যানেটোরিয়ামে ভর্তি থাকা উচ্চবিত্তরা। টিবি কাউকে ছাড়েনি। বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও ফ্রান্সের ছয় জনের একজন মারা গিয়েছেন যক্ষ্মায়। সাধে কি আর কুখ্যাত "ব্ল্যাক প্লেগ"-এর নাম অনুসারে টিবির নাম হয়েছে!

হোয়াইট প্লেগ?

ইউনিয়ান জ্যাকের পরিবর্তে লালকিল্লায় তেরঙ্গা ঝান্ডা পতপতানোর ঠিক এক বছর আগে, একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। বিজ্ঞানী সেলম্যান ওয়াকসম্যান আবিষ্কার করলেন টিবি রোগের মহৌষধ। স্ট্রেপটোমাইসিন। দিকে দিকে হইহই পড়ে গেল। ঢক্কানিনাদ সহযোগে ঘোষিত হল—"এসে গেছে, এসে গেছে, এসেছে—বাপেরও বাপ।"

সেরে যেতে শুরু করল রোগীরা। স্ট্রেপটোমাইসিনের লেজ ধরে ধরেই আবিষ্কৃত হল আইসোনিয়াজাইড। আগেই ছিল প্যারা অ্যামাইনো স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। দেখা গেল, একা স্ট্রেপটোমাইসিনের পরিবর্তে, একত্রে এই তিনটে ওষুধ, কাজ করে আরও বেশি। ব্যস। তারপরে আর কি? তারপরে লিখিত হল নব্য ইতিহাস।

জয়ের নয়। পরাজয়ের ইতিহাস। মানুষ আবিষ্কার করল, টিবির জীবাণু, ছেলের হাতের পেঁয়াজি নয়। তাকে প্রাথমিকভাবে ওষুধ দিয়ে কবজা করা যেতেই পারে, তবে, সেটা ওই প্রাথমিকভাবেই। জীবাণুটি ধুরন্ধর। সে অনায়াসেই গড়ে তুলতে পারে রেজিস্ট্যান্স। অর্থাৎ, খুব অল্প দিনেই জীবাণুটি নিজেকে বদলে নিতে পারে এমনভাবে, যাতে ওষুধটি আর তার উপর কাজ করবে না একটুও।

এর সাথে অবশ্য আরও একটি বিষয় জড়িত। অপ্রয়োজনীয় এবং অযথা অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার। চিকিৎসকেরা, চটজলদি পসারের লোভে মুড়িমুড়কির মতো ব্যবহার করে চলেছেন অ্যান্টিবায়োটিক। ব্যবহার করে চলেছেন এমন সব অ্যান্টিবায়োটিক যেগুলো টিবি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ব্যবহার করে চলেছেন এমন সব অ্যান্টিবায়োটিক, যেগুলো সাধারণ রোগে ব্যবহার না করলেও চলত। এবং, তাঁদের যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছেন সবজান্তা জনতা।

যাঁরা, ফেসবুক পোস্ট পড়েই বুঝে যান যে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু হচ্ছে, তাঁরা যে দোকানে গিয়ে বলবেন না—"দাদা একপাতা ক্ল্যাভাম ৬২৫/একপাতা মক্সিফ ৪০০ দেবেন তো . . . খুব ঠান্ডা লেগেছে . . ." এরকম ভাবাটাই অপরাধ। অবাক হলেন? আজ্ঞে হ্যাঁ, এই শর্মা, অর্থাৎ সব্যসাচী সেনগুপ্ত বলছে—"এই দু-টি ওষুধের প্রত্যেকটিই ব্যবহৃত হয় ড্রাগ রেজিস্টেন্ট টিবির চিকিৎসায়।"

নেট রেজাল্ট? মোট ফল? একে তো টিবির জীবাণু বেজায় ধুরন্ধর, তার উপর আবার, দুই-এ, মানুষ উদ . . .। সবে মিলে এই মুহূর্তে, পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি যে সংক্রামক রোগে মানুষের মৃত্যু হয়—সেটি টিবি। শেষ দু-বছরে, সারা পৃথিবীতে, এক কোটি পাঁচ লক্ষ মানুষ টিবি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। শেষ দু-বছরে, তেরো লক্ষ মানুষ টিবিতে মারা গেছেন। বিশ্ব জনসংখ্যার নিরিখে অঙ্কটা খুব কম শোনাচ্ছে, তাই না? শোনানোটাই স্বাভাবিক। অন্যান্য রোগের সাথে, টিবির পার্থক্যটা ঠিক এইখানেই।

একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি। ধরুন একজনের ডাইরিয়া হল। অথবা ডেঙ্গু। চিকিৎসা ব্যবস্থা ফেল মারল তাকে সুস্থ করে তুলতে। কী হবে? মানুষটি টপাস করে মরে যাবেন। ইমপ্যাক্ট—তাৎক্ষণিক। সংবাদপত্র এবং ফেসবুক জুড়ে হইহই রইরই। মুখে কালো কাপড়, হাতে মোমবাতি নিয়ে মিছিল। আর এই একই ঘটনা যদি টিবির ক্ষেত্রে হয়? যদি রোগীটি নিয়মিত ওষুধ না খায়, কিংবা ওষুধই ফেল করে রোগীটিকে সারিয়ে তুলতে . . . তখন? তখন, হে আমার সর্বজ্ঞানী বন্ধু

এবং বান্ধবীগণ, ত-খ-ন, রোগীটি দড়াম করে মরে যাবেন না। মৃত্যুর আগে ধুঁকতে ধুঁকতে তিনি কাটিয়ে দেবেন, আরও বেশ কিছু মাস। এমনকী, কখনো কখনো বেশ কিছু বছরও।

চিত্র. টিউবারকিউলোসিস রোগীর বুকের এক্স-রে

বোঝা গেল এবারে? গত দু-বছরের ওই যে এক কোটি পাঁচ লক্ষের হিসাব, ওইটা কেবলমাত্র নতুন টিবি রোগীদের সংখ্যা। নতুন, এবং পুরোনো যোগ করলে সংখ্যাটা এর চাইতে ঢের ঢের গুণ বেশি। কী? এবার একটু ভয় লাগছে? লাগাটাই উচিত। এবং লাগাটাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকী চিকিৎসকদের মধ্যেও টিবি নিয়ে ব্যাপক উন্নাসিকতা লক্ষ করেছি আমি। আমাকে নিত্যনৈমিত্তিক জর্জরিত হয়েছে প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণে।

—"টিবিইইইই? টিবি এখনও আছে?"

—"টিবিইইই? টিবি এখনও হয়?"

—"টিবি হাসপাতালে পোস্টিং আপনার? আমি তো ভাবতাম হাসপাতালটা উঠেই গ্যাছে।"

—"টিবি? নাহ্, টিবি ফিবি ভাই তোমার ডিপার্টমেন্ট, আমি বুঝি না ওসব (আমার চিকিৎসক বন্ধুদের উক্তি)।"

—"টিবি তো রিকশাওয়ালা আর মাতালদের হয়।"

ইত্যাদি ইত্যাদি প্রভৃতি।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সিংহভাগ (এক-তৃতীয়াংশ) এই মুহূর্তে, টিবির জীবাণু দ্বারা ইনফেক্টেড। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে হিসাবটা শতকরা চল্লিশ। হাঁউমাউ করবেন না, পুরো বিষয়টা আগে শুনুন। ইনফেক্টেড মানে সংক্রামিত। মানে, টিবির জীবাণু শরীরে থাকা। টিবি রোগ নয়।

কিন্তু, কিন্তু, এবং মন দিয়ে শুনুন, কিইইইইন্তু, যদি কোনোরকমভাবে আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, যদি হয় এইডস, যদি হয় অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, যদি আপনাকে বহুদিন ধরে খেতে হয় স্টেরয়েড বা ক্যান্সারের ওষুধ, তবে, এই চুপ করে থাকা জীবাণুই খোলস ছেড়ে থাবা বসাতে পারে আপনাকেও।

লাগছে? আরও বেশি ভয়? লাগছে? আতঙ্ক? গুড। এবার নিশ্চয়ই বুঝলেন, লড়াইটা কত জরুরি? এইবারে বোঝাই আসুন, লড়াইটা কতখানি অসম। কতখানি একপেশে। টিবির জীবাণু, যাকে বলে, প্রায় অজেয়। ওষুধের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা খুব দ্রুত গড়ে তুলতে পারে এরা। এবং যখন দেখে যে লড়াইয়ে জিততে পারছে না, তখন বর্ম পরে ঘাপটি মেরে, লুকিয়ে পড়ে শরীরের মধ্যে। আর তারপর, যেই ওষুধের কোর্স শেষ, যেই রোগী ভাবতে শুরু করেছে—"আই অ্যাম এ ডিস্কো ড্যান্সার", ওমনি ফিরসে আক্রমণ শানায় পিলপিলিয়ে।

তাই, এ রোগের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন একখানা ওষুধ, যেটা খাওয়া বন্ধ করে দিলেও, ওষুধের রেশ, শরীরে থেকে যাবে আরও বেশ কিছু মাস। প্রয়োজন ছিল এমন একটা ওষুধ, যেটা চিকিৎসকেরা চাইলেও টিবি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করে রেজিস্ট্যান্স গড়ে তুলতে পারবেন না। এরকম ওষুধ পাওয়া যাচ্ছিল না। হাল প্রায় ছেড়ে দেওয়ার মতো অবস্থা যখন, তখন শেষমেষ পাওয়া গেল। এবং সরকার, অভূতপূর্ব বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, ডাবলু এইচ ও (ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগ্যানাইজেশন)-র হাত ধরে। টিবির চিকিৎসাতে ব্যবহৃত নবতম ঔষধ—বেডাকুইলিন, বাজারে বিক্রি করা হবে না। পাওয়া যাবে না রতনদার দোকানে। ডাক্তারবাবুরা চাইলেও ব্যবহার করতে পারবেন না, অন্য কোনো রোগের চিকিৎসায়। এমনকী, প্রাইভেট প্র্যাকটিশনাররা ব্যবহার করতে পারবেন না টিবির চিকিৎসাতেও। কারণ, তথ্য বলছে, বেসরকারি পরিষেবাতে, টিবির চিকিৎসা, কোনো নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে করা হয় না। তাই, এই ঔষধ পাওয়া যাবে শুধু মাত্র সরকারি পরিষেবাতেই। পাওয়া যাবে, সরকারি চিকিৎসাধীন ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবির চিকিৎসাতে—কিছু শারীরিক পরিস্থিতি বিশেষে।

সরকার, সেটা সবুজ হোক কিংবা গেরুয়া অথবা লাল, এইরকম সিদ্ধান্তও নেন। এবং এবার থেকে এটা মাথায় রাখবেন, সরকারকে 'গা' বলে দেওয়ার আগে। সরকার যদি সত্যিই 'গা-' হত, আপনি আর বেঁচে থাকতেন না। মরে যেতেন স্রেফ। আশা রাখছি, লড়াইটা এবার হয়তো হয়তো হয়তো, জিতেই যাব। আর যদি নাও জিততে পারি, একটা সমানে সমানে যুদ্ধ অন্তত চলবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, টিবি হাসপাতালের চিকিৎসক।

ব্যালানাইটিস বা লিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহ

ডা. জয়ন্ত দাস

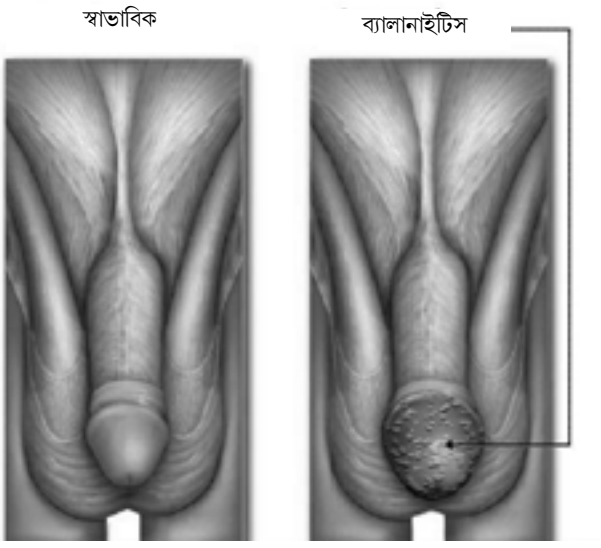

এরকম অনেক রোগী দেখছি আজকাল।

কী রকম?

রোগী একটু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে, নীচু গলায় বলেন, ডাক্তারবাবু, আমার ওখানে কেমন লাল হয়ে আছে, চুলকাচ্ছে।

'ওখানে' মানে? মানেটা রোগী সহজে বলতে চান না, অনেকে নিজের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন, ওই যে, ওখানে। আজকাল কেউ আবার নিজের মোবাইল থেকে ডাক্তারবাবুকে ছবি দেখান।

সমস্যাটা লিঙ্গমুখে। আর প্রায়শই লজ্জার জন্য রোগীরা ডাক্তার দেখাতে দেরি করেন। অনেক সময় আবার ওষুধের দোকানদারদের জিজ্ঞেস করে ওষুধ লাগান। ওষুধের দোকানদারদের দেওয়া লাগানোর ওষুধে স্টেরয়েড থাকে না, এমনটা হতে দেখিনি। ফলে স্টেরয়েড-মিশ্রিত ওষুধ লাগানো হয়, সাময়িক আরাম হয়, কিন্তু আসলে ক্ষতি হয়।

সমস্যাটা কী? হয় কেন? কী হলে সন্দেহ করবেন? ডাক্তার কীভাবে রোগ ধরেন? কী করলে সারে? সেই সব প্রশ্নের উত্তর এবার একে একে।

ব্যালানাইটিস বা লিঙ্গমুণ্ড-প্রদাহ রোগটা কী?

পুরুষমানুষের লিঙ্গের মাথা আর তাকে ঘিরে যে চামড়া, যা একটু সরানো নাড়ানো যায়, সেই চামড়ার রোগ হল ব্যালানাটিস। এই চামড়াকে ইংরেজিতে বলে ফোরস্কিন, সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলায় বলে শিশ্নাগ্রত্বক। বাংলায় অগ্রত্বকও বলে, কিন্তু বাংলা কথাদুটোর তেমন প্রচলন নেই। মুসলমান ও ইহুদিদের ছোটোবেলায় এই অগ্রত্বক কেটে বাদ দেওয়া হয়, বলে ছুন্নৎ বা সুন্নৎ করা। ধর্মীয় রীতি মানা উচিত না অনুচিত সে প্রশ্নে না গিয়ে বলা যায়, ছুন্নৎ করা থাকলে ব্যালানাইটিস কম হয়।

বাংলায় এই রোগকে বলা যায় লিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহ।

লিঙ্গমুণ্ড-প্রদাহের লক্ষণ কী?

- লিঙ্গের ডগায় জ্বালা, ব্যথা, চুলকুনি ও দুর্গন্ধ।
- লিঙ্গমুণ্ডকে লাল ও ফোলা-ফোলা দেখায়।
- বেশি হলে, পুঁজের মতো রস জমে, বিশেষ করে ছুন্নৎ না করা থাকলে অগ্রত্বকের তলায় এই রস জমে।
- প্রস্রাবে জ্বালা ও ব্যথা।

কখন ডাক্তার দেখাবেন?

ব্যালানাইটিস হয়েছে মনে হলেই ডাক্তার দেখাবেন।

আর ওপরের লক্ষণগুলোর মধ্যে একটি বা কয়েকটি থাকলেই ব্যালানাইটিস হয়েছে কিনা তা ভাবতে হবে ও ডাক্তার দেখাতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওপরের লক্ষণগুলো কিছু যৌনরোগেও হতে পারে, আর সেগুলো হবার সম্ভাবনা থাকলে ডাক্তার দেখানো খুব দরকার। লুকোছাপা করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না।

ফাইমোসিস জিনিসটার সঙ্গে এখানে একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া ভালো, কেননা এর সঙ্গে ব্যালানাইটিস ও অন্য কিছু সমস্যা জড়িত। কোনো কোনো পুরুষমানুষের অগ্রত্বকের মুখের ছিদ্রটা ছোটো হয়, তখন অগ্রত্বককে লিঙ্গমুণ্ডের ওপর দিয়ে টেনে পেছনে আনা যায় না। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অল্পমাত্রায় এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বড়ো বয়সে এরকম হলে অসুবিধা আছে—একে বলে ফাইমোসিস। অনেকের বড়ো বয়সেও ফাইমোসিস থাকে, কিন্তু অসুবিধে করে না। অসুবিধা বলতে যৌনক্রিয়ায় অসুবিধা, লিঙ্গমুণ্ড পরিষ্কার না করতে পারার ফলে দুর্গন্ধ, প্রস্রাব আটকে যাওয়া ও ব্যালানাইটিস হওয়া। প্রাপ্তবয়স্কদের ফাইমোসিস হলে ডাক্তার দেখাতে হবে। বাচ্চাদের ফাইমোসিস অসুবিধা করলে ডাক্তার দেখাতে হবে।

ব্যালানাইটিস-এর চিকিৎসা কী?

☞ প্রথম কথাই হল, লিঙ্গমুণ্ড নিয়মিত ধুতে হবে। ব্যালানাইটিস থাকলে ধুতে হবে। না থাকলেও সাধারণ পরিচ্ছন্নতার বিধি হিসেবে লিঙ্গমুণ্ড ধুতে হবে। অনেকেই শরীরের অন্য সব জায়গা খুব পরিষ্কার রাখেন, কিন্তু লিঙ্গমুণ্ড ও ওইরকম 'লজ্জাস্থান' (যোনিদ্বার ও পায়ুদ্বার) পরিষ্কার করেন না। আমাদের ছোটোবেলায় ওসব জায়গা নিয়ে কথা বলা ঠিক ভদ্রজনোচিত মনে করে হত না বলেই বোধহয় সন্তানদের ওই জায়গাগুলো পরিষ্কার করে ধুতে বলাও হয় না।

☞ বাচ্চাদের লিঙ্গমুণ্ডও একইভাবে পরিষ্কার করা দরকার। তবে বাচ্চারা যেহেতু নিজে নিজে পরিষ্কার করতে পারে না, মা-বাবা পরিষ্কার করার সময় খেয়াল রাখবেন যেন লিঙ্গের অগ্রত্বক আস্তে আস্তে পেছনে টেনে লিঙ্গমুণ্ড যতটা বের হয় ততটাই ধোয়া হয়, জোর করে বেশি টানাটানি করার দরকার নেই। সামান্য ফাইমোসিস থাকলে অসুবিধা নেই, কিন্তু যদি অগ্রত্বকের ছিদ্র এতটাই ছোটো হয় যে প্রস্রাব আটকে যাচ্ছে বা বাচ্চার ব্যথা হচ্ছে, তাহলে ডাক্তার দেখান।

☞ বাচ্চাদের বেশিক্ষণ ডায়াপার পরিয়ে রাখলে বা ভেজা কাঁথায় রাখলে লিঙ্গমুণ্ডে জ্বালা হতে পারে।

☞ সাবান, শ্যাম্পু বা কোনো জীবাণুনাশক দিয়ে ধোবেন না, শুধুমাত্র পরিষ্কার কলের জল দিয়ে ধুতে হবে। প্রসঙ্গত, বাঙালির অভ্যেস হল সব কিছুতেই ডেটল মিশিয়ে দেওয়া। লিঙ্গে জ্বালা, ডেটল দিয়ে ধোও। অণ্ডকোষে চুলকানি, ডেটল দিয়ে ধোও। বাচ্চার গায়ে র‍্যাশ বেরিয়েছে, বাচ্চাকে ডেটলজলে স্নান করাও, তার জামাকাপড় ডেটল দিয়ে ধোও। অনেকে আবার এমনি-এমনি জামাকাপড় ধোবার জলে আর স্নানের জলে ডেটল মিশিয়ে ভাবেন, খুব পরিষ্কার হওয়া গেল। গর্ব করে আমাদের কাছে বলেন, আমার কোনো চর্মরোগ হয়নি, আমি তো রোজ ডেটল . . . ! আজ্ঞে না মশাই, ডেটল খামোকা ব্যবহার করলে কোনো লাভ নেই, ক্ষতি আছে বিস্তর।

চিত্র ১. ব্যালানাইটিস

চিত্র ২. ফাইমোসিস

☞ মনে রাখবেন, প্রাপ্তবয়স্কদের লিঙ্গমুণ্ডের ওপরের চামড়ার গ্রন্থি থেকে স্মেগমা বলে একরকম রস বেরোয়, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকদিন ধোওয়া না হলে সেই স্মেগমা খানিকটা শক্ত হয়ে যায়, তখন অগ্রত্বক সহজে টেনে লিঙ্গমুণ্ড বের করা যায় না। ফলে স্মেগমার ওপর জীবাণু সংক্রমণ হয়ে ব্যালানাইটিস ঘটে।

☞ লিঙ্গে সামান্য জ্বালা, সামান্য ফাটাভাব, একটু লালভাব—এতে ডাক্তার দেখানোর আগে যেটা করতে পারেন তা হল একটু গায়ে মাখার ভেজলিন জাতীয় ক্রিম (ওষুধ ক্রিম নয়, চড়া গন্ধযুক্ত প্রসাধন নয়, মেকআপ করার ক্রিম নয়) দিনে দু-তিনবার করে লাগাতে পারেন। কাজ না হলে অতি অবশ্যই ডাক্তার দেখান।

☞ ব্যালানাইটিস থাকাকালীন যৌনসঙ্গম করা কি উচিত? ডাক্তার যদি বলেন যে সংক্রামক রোগ নেই ও আপনার যদি ব্যথা না থাকে, তো যৌনসঙ্গম চলতে পারে।

ব্যালানাইটিসের কারণগুলো কী কী?

- পরিচ্ছন্নতার অভাব ও স্মেগমা জমা হওয়া।
- ফাইমোসিস ও তার ফলে প্রস্রাব জমা হওয়া।
- সাবান, পারফিউম, ডেটল জাতীয় জীবাণুনাশকের ভুল ব্যবহার।
- ক্যান্ডিডা ছত্রাক সংক্রমণ।
- ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ।
- যৌনরোগ।
- একজিমা, সোরিয়াসিস, লাইকেন স্ক্লেরোসাস ইত্যাদি চর্মরোগ।
- বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, লিঙ্গ নিয়ে অতিরিক্ত নাড়াচড়া করা, যা শিশু

নিজে করতে পারে (তত ভয়ের ব্যাপার নয়) বা অন্য কেউ করতে পারে (সাবধান!)। বড়োদেরও এমন হতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসা আবশ্যক।

চিকিৎসক কেমন করে ব্যালানাইটিস-এর চিকিৎসা করেন?

কী কারণে ব্যালানাইটিস হয়েছে সেটা বুঝে চিকিৎসক সেটা সারানোর চেষ্টা করেন।

➤ সামান্য ত্বকের প্রদাহে ভেজলিন জাতীয় মসৃণকারক ক্রিম, বড়োজোর কম শক্তির স্টেরয়েড ক্রিম। বাচ্চাদের মূলত এটাই দেওয়া হয়।

➤ তবে একটু বেশি বয়সে ক্যান্ডিডা ছত্রাক হবার সম্ভাবনা খুব বেশি, বিশেষ করে ডায়াবেটিস থাকলে। সে ক্ষেত্রে ছত্রাকনাশক ক্রিম (মাইকোনাজোল ইত্যাদি) দিতে হয়। মহিলাদের যোনিতে ক্যান্ডিডা ছত্রাক এমনিতেই থাকতে পারে, কোনোরকম সমস্যা তৈরি না করেই। এই জন্য বিবাহিত (বা যৌনকর্মে অভ্যস্ত) পুরুষদের লিঙ্গমুণ্ডে ক্যান্ডিডা ছত্রাক সংক্রমণ হবার সম্ভাবনা খুব বেশি, তাই এদের ব্যালানাইটিস হলে ছত্রাকনাশক ক্রিম প্রথমেই দেওয়া হয়। সংক্রমণ বেশি জোরদার হলে, মুখে খাবার ছত্রাকনাশক ওষুধ দিতে হবে।

➤ ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ তুলনায় কম হয়। তবে অন্য কোনো যৌনরোগ থাকলে ব্যাকটিরিয়া সংক্রমণ সম্ভাবনা বেশি। সে ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

➤ দরকার হলে অগ্রত্বক কেটে বাদ দিতে হবে। এই ছোটো অপারেশনকে বলে সারকামসিশন। ছোটো বাচ্চাদের অজ্ঞান করে এই অপারেশন করতে হয়, আর বড়োদের স্থানীয় অবেদন (লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া) করে অপারেশন করা যায়।

➤ একজিমা, সোরিয়াসিস, লাইকেন স্ক্লেরোসাস ইত্যাদি চর্মরোগ তত বেশি দেখা যায় না, কিন্তু চিকিৎসক (অনেক সময় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ) ছাড়া আর কেউ এগুলো চিনতে পারেন না। এগুলোর জন্য বেশ জোরালো লাগানোর স্টেরয়েড ক্রিম দেবার দরকার হয়। বলা বাহুল্য এমন ওষুধ কোনো রোগী নিজেই উপযুক্ত ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়া দিলে বিপদে পড়বেন।

➤ আর শেষ কথাটা বারবার বলা দরকার। ব্যালানাইটিস হোক বা না হোক, নিয়মিত লিঙ্গমুণ্ড ধোয়া, স্মেগমা পরিষ্কার করা, এটা সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির অংশ। সাবান বা ডেটল জাতীয় অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ধুলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তার সঙ্গে ডায়াবেটিস থাকলে তার উপযুক্ত চিকিৎসা, যৌনরোগ আটকানোর চেষ্টা (একজন মাত্র যৌনসঙ্গী, কন্ডোমের যথাযথ ব্যবহার)। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

গ্রেট ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর সরকারি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ওয়েবসাইট-এর সহায়তা নিয়ে লিখেছেন।

ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর ওয়েবসাইট-টি দেখতে ক্লিক করুন: https://www.nhs.uk/conditions/Balanitis/

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:

কলকাতা: সুমন্ত বিশ্বাস (৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (৬৯৮৮-২২৪১), বই-চিত্র (কফি হাউস তিনতলা), পাতিরাম, ক্রান্তিক, মনীষা (কলেজ স্ট্রিট), অমর কোলে (বি.বা.দী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন) সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী), রথীন-দা (গোলপার্ক) সৈকত প্রকাশন (আগরতলা)।

যোগাযোগ: ই-মেল-utsamanush1980@gmail.com

স্ক্রাব টাইফাস
প্রাথমিক পরিচয়

স্ক্রাব টাইফাসের সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় ছিল না, কিন্তু আজকাল এটা এদেশেও অনেক হচ্ছে। এই রোগটার প্রাথমিক পরিচয় দিচ্ছেন **ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা**।

চলুন, একটু পিছিয়ে যাই। স্ক্রাব টাইফাসের প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায় চীনে। যিশু খ্রিস্টের জন্মেরও ৩১৩ বছর আগে। অর্থাৎ, রোগটি যতই আপনার কাছে নতুন লাগুক আসলে সে মোটেই বয়সে নবীন নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় ১৮০০০ সৈন্য এই রোগের কবলে পড়েন। কী, এবার একটু ভয় লাগছে? দাঁড়ান, দাঁড়ান, সবে তো কলির সন্ধ্যে। কান খাড়া করে শুনুন, বছরে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ এই জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হন এবং এক মিলিয়ন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন। অর্থাৎ কী দাঁড়াল? রোগটি মোটেই বিরল নয়। আপনি চিনতেন না এতদিন, এই যা।

এটি এক ধরনের রিকেটসিয়াল ডিজিজ। একরকম 'মাইট', সেটা একধরনের পোকা বলতে পারেন, কামড়ের দ্বারা এই রোগ ছড়ায়। মাইটটা এই এট্টুখানি—০.২-০.৪ মিলিমিটার, তারই এত তেজ! ভাবুন একবার! জীবাণুটির নাম একটু কটকট-পটপট . . . ওরিয়েন্সিয়া শুশুগামুশি। এবার আপনি বলবেন ভাইরাস শুনেছি, ব্যাকটিরিয়া শুনেছি কিন্তু রিকেটসিয়া কী? এটিও এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া। এ আবার ঘন ঘন আকার পালটে ফেলে। কখনো গোল, কখনো সরু সুতোর মতো।

মাইট কামড়ানোর ৬-২০ দিন (গড়ে ১০ দিন) পরে রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। কামড়ানোর জায়গায় প্রথমে একটু উঁচু গুটিমতো র‍্যাশ, পরে পোড়া ঘায়ের মতো কালচে 'এস্কার' তৈরি হয়। এবার বিধি বাম . . . আমাদের বাদামি বা কালো চামড়ায় অনেক সময়ই এস্কার লুকিয়ে থাকে, বোঝা যায় না। তারপর যত দিন গড়ায় . . .

উচ্চ তাপমাত্রা,
র‍্যাশ, গায়ে ব্যথা,
লিভার, প্লীহা বৃদ্ধি,
ফুসফুস, হৃদ্‌যন্ত্র, মস্তিষ্ক-প্রদাহ,
বুকে, পেটে জল জমে যাওয়া,
লিম্ফ নোড (মূলত কুঁচকির) ফুলে যাওয়া,
ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার ইনভেস্টিগেশনে আসি। মূল রোগ নির্ণয় স্ক্রাব আইজিএম এবং ওয়েল-ফেলিক্স এই দু-টি টেস্ট দিয়ে করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য রক্ত পরীক্ষায় অ্যালবুমিন কমে যাওয়া, লিভার এনজাইমের পরিমাণ বাড়া, অণুচক্রিকার সংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসার থেকে অনেক বেশি জটিল রোগ নির্ণয়। রোগ ধরা পড়তেই অনেক দেরি হয়ে যায়। মূল চিকিৎসা ডক্সিসাইক্লিন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন ও অন্যান্য কয়েকটি ওষুধ ব্যবহার করে করা যায়। সেটা আপনার ডাক্তারবাবুর ওপর বিশ্বাস রাখুন। দয়া করে ভীষণ আত্মবিশ্বাসী আপনি, "ডাক্তার আর কী দেবে? ওই তো দুটো ক্ল্যাভাম, তিনটে ব্রুফেন" বলে নিজে নিজে ওষুধ খেয়ে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। ডাক্তারের কাজটা তাঁকেই করতে দিন। অনেক ঘুমহীন রাতের অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি রোগ ধরে ওষুধ লেখার পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। আসলে ওষুধ লেখা আপনি যতটা সোজা ভাবেন তার চেয়ে তিনশো চুয়াত্তর গুণ কঠিন। দয়া করে আত্মবিশ্বাস সংযত করুন। আপনার প্রয়োজনে। সমাজের প্রয়োজনে। রোগের অন্যান্য জটিলতা দেখা দিলে চিকিৎসাও জটিল হয়ে যায়—সে সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনায় যাব না।

রোগ প্রতিরোধ নিয়ে দু-একটা কথা বলেই বিদায় নেব। মূলত বন্য বা ঝোপঝাড়পূর্ণ এলাকায় বন্য জন্তু, ইঁদুর এসব থেকে রোগ ছড়ায়। পারলে ঝোপঝাড় এড়িয়ে চলুন। জীবিকার প্রয়োজনে যদি যেতেই হয় পুরোহাতা জামা, গ্লাভস ব্যবহার করুন। কীটপতঙ্গ দূর করার রাসায়নিক স্প্রে করুন।

খুব কঠিন হয়ে গেল কি?

বেশ, শুধু এটুকু মনে রাখুন পোকা কাটার মতো দাগ, সেইসাথে উচ্চ-তাপমাত্রা দেখলেই সতর্ক হন। ডাক্তারের পরামর্শ নিন। একটু বিশ্বাস রাখুন।

আর সামান্য ভাবুন, ভাবুন যেকোনো রোগ আর তার প্রতিরোধ নিয়ে, রোগ হলে ঠিক সময়ে ডাক্তার দেখানো নিয়ে।

স্ক্রাব টাইফাস নিয়েও ভাবুন। নাকি বলব, স্ক্রাবুন, স্ক্রাবা প্র্যাকটিস করুন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালে শিশুরোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

থ্যালাসেমিয়া একটি মারণরোগ—এর প্রতিরোধ সম্ভব

ডা. কাঞ্চন মুখার্জী

থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত সমস্যা। এই রোগে মানুষের রক্তের লোহিতকণিকা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে রোগীর অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা দেখা যায় এবং রক্তের অক্সিজেন বহন করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। সাধারণত শৈশবকালেই এই রোগ ধরা পড়ে। কয়েক বছরের মধ্যেই শিশুর প্লীহা (Spleen) বড়ো হয়ে যায়, হাড় দুর্বল হয়ে যায় এবং শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়। শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতি মাসে এক বা একাধিক বার রক্ত সঞ্চালন করতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ২০-৩০ বছর বয়সের মধ্যেই বাচ্চা মারা যায়।

পৃথিবীতে যত থ্যালাসেমিয়া রোগী আছে তার মধ্যে দশ শতাংশই বাস করেন ভারতবর্ষে। আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ১৫০০ শিশুর জন্ম হয় থ্যালাসেমিয়া জাতীয় সমস্যা নিয়ে। ভারতীয়দের মধ্যে প্রতি ৩০ জনের মধ্যে একজন থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক। আর স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই যখন এই রোগের বাহক হন তখন সন্তানের থ্যালাসেমিয়া রোগ হবার সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। ইংরেজি ভাষায় বাহকদের বলা হয় carriers বা থ্যালাসেমিয়া মাইনর (Minor) আর রোগীদের বলা হয় থ্যালাসেমিয়া মেজর (Major)।

এবার দেখে নেওয়া যাক বাবা-মায়ের কাছ থেকে থ্যালাসেমিয়া রোগ সন্তান-সন্ততির কাছে কীভাবে পৌঁছোয়। মানুষের শরীরে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এক জোড়া জিনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এর একটি আসে বাবার কাছ থেকে আর একটি আসে মায়ের কাছ থেকে। বংশগত রোগের ক্ষেত্রেও একই সূত্র প্রয়োজন। যাদের শরীরে এই দুই জোড়ার মধ্যে একটি ভালো জিন অন্যটি মন্দ জিন তারা হলেন সেই রোগের বাহক। যাদের শরীরে রোগের জন্য দায়ী দু-টি মন্দ জিনই উপস্থিত থাকে তারা হলেন সেই রোগের রোগী। অর্থাৎ বাবা-মা দু-জনেই যদি থ্যালাসেমিয়ার বাহক (Thalassemia Minor) হন এবং তাঁদের মন্দ জিনটি সন্তানকে দেন তাহলে তাঁদের সন্তানের থ্যালাসেমিয়া রোগটি (Thalassemia Major) হয়। এর সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। আর বাবা-মায়ের মধ্যে যদি একজন ভালো জিনটি দেন এবং আর একজন মন্দ জিনটি দেন তাহলে তাঁদের সন্তান হন থ্যালাসেমিয়ার বাহক। এর সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ। যদি দু-জনেই ভালো জিনটি দেন তাহলে সন্তান সম্পূর্ণভাবে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত হন। এর সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, বাবা-মা, কে কোন জিনটি দেবেন সেটি কিন্তু কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। সম্ভবত প্রকৃতির খেয়ালেই সে ঘটনা ঘটে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে কোনো মানুষ থ্যালাসেমিয়ার বাহক কিনা কীভাবে জানবেন। এর জন্য খুব সাধারণ একটি রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন। এর নাম HPLC। এই টেস্টের জন্য প্রায় চারশো টাকা খরচ হয়। সন্তান চাইছেন এ-রকম সব দম্পতির এই টেস্ট করিয়ে নেওয়া ভালো। সাইপ্রাস (Cyprus) দেশে আইন করে দু-জন থ্যালাসেমিয়া বাহকের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সে দেশ থেকে এই রোগ প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে এ-ধরনের আইন প্রণয়ন সম্ভব নয়। কারণ এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে।

ধরা যাক বিয়ের পর বা গর্ভাবস্থায় প্রথম দু-মাসের মধ্যে জানা গেছে বাবা-মা দু-জনেই থ্যালাসেমিয়ার বাহক। তাহলে কী করণীয়? প্রথম কথা, ঘাবড়াবেন না। এই পরিস্থিতিতেও বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া মেজর হবার সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। বাকি ৭৫ শতাংশ বাচ্চা কিন্তু সুস্থ। এই সমস্ত বাবা-মায়ের রক্তে এর পর একটি করে জিন টেস্ট করতে হয়। তাতে বোঝা যায় ঠিক কী ধরনের জেনেটিক সমস্যা বা মিউটেশন-

এর জন্য তারা থ্যালাসেমিয়া বাহক হয়েছেন। বাবা-মায়ের রক্তে সঠিক মিউটেশন চিহ্নিত করার পর আসে ভ্রূণ পরীক্ষার পালা। ভ্রূণের মধ্যে ওই দু-টি মিউটেশনই থাকলে তবেই বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া মেজর হবে। যেকোনো একটি মিউটেশন থাকলে বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া মাইনর হবে। আর কোনো মিউটেশনই না থাকলে বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত হবে।

এবার আসি ভ্রূণ পরীক্ষাসংক্রান্ত কিছু কথায়। ভ্রূণ পরীক্ষার জন্য মূলত যে টেস্ট করা হয় তার নাম CVS (Chorionic Villus Sampling)। এর অর্থ বাচ্চার সাথে যে ফুলটি (Placenta) থাকে তার সামান্য অংশ বের করে পরীক্ষা করা। গর্ভাবস্থার তিন মাস পর থেকে

চিত্র ১. CVS পরীক্ষা

এই টেস্ট করা যায়। USG মেশিনে দেখতে দেখতে মায়ের পেটের মধ্যে একটি বিশেষ ছুঁচ (needle) পাঠিয়ে এই কাজ করা হয়। মাকে এজন্য অজ্ঞান করতে হয় না। তবে, মায়ের পেটের সামান্য একটু অংশ অবশ করে নেওয়া হয় যাতে ব্যথা না লাগে। CVS থেকে প্রাপ্ত নমুনা (sample) এবার পাঠিয়ে দেওয়া পরবর্তী পরীক্ষার জন্য। রেজাল্ট পেতে সময় লাগে সপ্তাহ দুয়েক। CVS সম্পর্কে একটি কথা অবশ্য জানা প্রয়োজন। শতকরা ৯৯ জনের কোনো সমস্যা হয় না তবে এক শতাংশের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বাচ্চা সুস্থ কিনা জানতে হলে এইটুকু ঝুঁকি নিতেই হয়। আপনাকে ভাবতে হবে ঝুঁকি এখন নেওয়া ভালো না কি সারাজীবন একটি অসুস্থ সন্তানের দায়িত্ব নেওয়া ভালো।

নানারকম টেস্টের জটিলতায় এতক্ষণে হয়তো ভাবতে শুরু করেছেন এর ব্যয়ভার সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই সমস্ত টেস্টের খরচ আনুমানিক ১৫-২০ হাজার টাকা। যাঁরা এত খরচ করতে পারবেন না তাঁরা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ বা নীলরতন সরকার হাসপাতালের হিমাটোলজি বিভাগে যেতে পারেন। এই দুই হাসপাতালের বাইরে পশ্চিমবঙ্গে আর কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়ার জন্য ভ্রূণ পরীক্ষা হয় কিনা লেখকের জানা নেই। সরকারি হাসপাতালের টেস্ট কম বিশ্বাসযোগ্য এ-রকম ভাবার কোনো কারণ নেই।

এখন ধরে নেওয়া যাক গর্ভাবস্থায় চার মাসের মাথায় একটি ভ্রূণের থ্যালাসেমিয়া মেজর ধরা পড়েছে। তাহলে কী করণীয়? এ-রকম পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ মা-বাবাই গর্ভপাতের রাস্তা বেছে নেন। ভারতবর্ষে নিয়মানুযায়ী ২০ সপ্তাহ বা পাঁচ মাস পর্যন্ত বাচ্চা নষ্ট করানো যায়। সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত ডাক্তারের কাছে গর্ভপাত করালে মায়ের স্বাস্থ্যহানির বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। পরবর্তীকালে গর্ভধারণেও কোনো অসুবিধা হয় না। মনে রাখতে হবে বাবা-মা থ্যালাসেমিয়ার বাহক হলে যতবার প্রেগন্যান্সি আসবে ততবারই ভ্রূণের পরীক্ষা করাতে হবে।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা হয় না। রোগ উপশম-এর জন্য কিছু ব্যবস্থা নিয়ে রোগীকে সাময়িক সুস্থ রাখা যায় মাত্র। বারংবার রক্ত সঞ্চালনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও (Side-effects) অনেক। কয়েক বছর বাদেই প্লীহা বাদ দেবার জন্য অপারেশন (Splenectomy) করতে হয়। অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (Bone Marrow transplant) এবং স্টেম সেল প্রতিস্থাপন এর মতো আধুনিক চিকিৎসা ভীষণ ব্যয়বহুল। সব ক্ষেত্রে সফলও হয় না। এজন্য এই মারণ-রোগের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে একটাই রাস্তা, প্রতিরোধ। বিয়ের পর-পরই স্বামী-স্ত্রী থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার কিনা জানার জন্য HPLC Test অবশ্যই করানো উচিত। দু-জনের মধ্যে যেকোনো একজন যদি থ্যালাসেমিয়া মুক্ত থাকেন তাহলেই আর কোনো চিন্তা থাকে না। যদি দু-জনেই থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার হন তাহলে দু-জনেরই জিন টেস্ট করা প্রয়োজন। তারপর বাচ্চা এলে ভ্রূণের পরীক্ষা করানো অবশ্যকর্তব্য। আর একবার মনে করিয়ে দিই, এই পরীক্ষাগুলো করাতে অন্য কোথাও যেতে হয় না। কলকাতাতেই অন্ততপক্ষে দু-টি সরকারি হাসপাতালে এই সমস্ত পরীক্ষা করানো যায়। খরচও বেশি নয়। সামান্য একটু সচেতনতা দেখাতে পারলেই থ্যালাসেমিয়ার মতো মারণ রোগের প্রতিরোধ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কাঞ্চন মুখার্জী, এমআরসিওজি (লন্ডন), স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ।

হাঁটু বদল বা নি-রিপ্লেসমেন্ট

ধনী দেশে নি-রিপ্লেসমেন্ট একটা রুটিন অপারেশন হলেও আমাদের দেশে এই অপারেশনের সুযোগ পান কেবল ধনবানরাই। ক্ষতিগ্রস্ত, ক্ষয়ে যাওয়া বা রোগগ্রস্ত হাঁটুর জোড়কে কৃত্রিম জোড় দিয়ে বদলে দেওয়াই হল নি-রিপ্লেসমেন্ট বা হাঁটু-প্রতিস্থাপন—লিখেছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

যেকোনো বয়সের প্রাপ্তবয়স্কেরই হাঁটু-প্রতিস্থাপন করা যায়, যদিও বেশি করা হয় ৬০ থেকে ৮০ বছর বয়সিদের। এখন কমবয়সিদেরও বেশি বেশি হাঁটু-প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে।

হাঁটু-প্রতিস্থাপনের কথা তখন বিবেচনা করা হয় যখন হাঁটু এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত যে তার নড়া-চড়া সীমিত হয়ে গেছে এবং বিশ্রাম নেওয়ার সময়ও যদি ব্যথা হয়। যে কারণের জন্য সবচেয়ে বেশি হাঁটু-প্রতিস্থাপন করা হয় তা হল হাঁটুর অস্টিয়োআর্থ্রাইটিস। এ ছাড়া রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, হিমোফিলিয়া, গাউট, হাড়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি (বোন ডিসপ্লেসিয়া), রক্ত চলাচলের অভাব থেকে হাঁটুর হাড়ের অংশবিশেষের মৃত্যু (এভাস্কুলার নেক্রোসিস), হাঁটুর আঘাত বা হাঁটুর বিকৃতি (যাতে ব্যথা আছে এবং তরুণাস্থি ক্ষয়ে গেছে)-তেও হাঁটু-প্রতিস্থাপনের দরকার পড়তে পারে।

হাঁটু-প্রতিস্থাপন একটা বড়ো অপারেশন। তাই ফিজিয়োথেরাপি বা স্টেরয়েড ইঞ্জেকশনের মতো চিকিৎসায় যদি ফল না হয়, তখন এই অপারেশনের কথা বিবেচনা করা হয়। এই অপারেশন তখন করা যেতে পারে, যখন—

- হাঁটুতে তীব্র ব্যথা, ফোলা এবং শক্ত ভাবের জন্য চলাফেরা করা কমে গেছে।
- হাঁটু ব্যথা এত বেশি যে জীবনের মান এবং ঘুম বিঘ্নিত হচ্ছে।
- বাজার-যাওয়া, স্নান করার মতো দৈনন্দিন কাজকর্ম যখন দুঃসাধ্য বা অসাধ্য।
- চলাফেরা কমে যাওয়ার জন্য অবসাদে ভুগছেন।
- কাজ করা যাচ্ছে না, স্বাভাবিক সামাজিক জীবন বিঘ্নিত হচ্ছে।

এ ছাড়া বড়ো অপারেশন ও তৎপরবর্তী পুনর্বাসন চালানোর মতো স্বাস্থ্য থাকা চাই।

দুই রকমের অপারেশন করা হয়—পুরো হাঁটু-প্রতিস্থাপনে জোড়ের দুটো দিকই বদল করা হয়, আর আংশিক হাঁটু-প্রতিস্থাপনে জোড়ের কেবলমাত্র একটা দিক বদল করা হয়।

এই চিকিৎসায় ভালো ফল পেতে হলে অপারেশনের আগে ব্যায়াম করে হাঁটুর আশপাশের মাংসপেশিগুলোকে মজবুত করা উচিত। উচিত ফিজিয়োথেরাপিস্টের সাহায্য নেওয়া।

অপারেশনের পর ৩-৫ দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়। কিন্তু সেরে উঠতে কত দিন লাগবে তা নির্ভর করে রোগীর স্বাস্থ্য এবং কী

ধরনের অপারেশন করা হয়েছে, তার ওপর। প্রথমে রোগীকে ক্রাচ বা ফ্রেম ব্যবহার করতে হয়, ফিজিয়োথেরাপিস্ট শেখান কোন ব্যায়ামে হাঁটু মজবুত হবে। বেশিরভাগ রোগী ৬ সপ্তাহ নাগাদ সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারেন, ১২ সপ্তাহ নাগাদ গাড়ি চালাতে পারেন। পুরোপুরি সেরে উঠতে বছর দুয়েক লাগতে পারে। খুব অল্প কিছু রোগী দু-বছরের পরও কিছু ব্যথা অনুভব করতে পারেন।

হাঁটু-প্রতিস্থাপন একটা বড়ো অপারেশন। তাই ফিজিয়োথেরাপি বা স্টেরয়েড ইঞ্জেকশনের মতো চিকিৎসায় যদি ফল না হয়, তখন এই অপারেশনের কথা বিবেচনা করা হয়।

সাধারণত এই অপারেশনে জটিলতা হয় না বললেই চলে। খুব অল্প কিছুক্ষেত্রে হাঁটু শক্ত (stiff) হয়ে যেতে পারে, অপারেশনের ক্ষতে জীবাণুসংক্রমণ হতে পারে, প্রতিস্থাপিত জোড়ে সংক্রমণ হলে আবারও অপারেশন করতে হতে পারে, জোড়ে রক্তক্ষরণ হতে পারে, হাঁটুর চারপাশের লিগামেন্ট, ধমনি বা স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, গভীর শিরাগুলোতে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে (deep vein thrombosis), হাঁটুতে ব্যথা অপারেশনের পরেও থেকে যেতে পারে, অপারেশনের সময় বা অপারেশনের পরে প্রতিস্থাপনের আশপাশের হাড় ভাঙতে পারে। অনেক সময় নতুন জোড় স্থিতিশীল না হলে আবারও অপারেশন করতে হয়।

নতুন হাঁটুর যত্ন কীভাবে?

- ব্যথা ও প্রদাহ কমানোর জন্য বেদনানাশক-প্রদাহরোধী ওষুধ খেতে হয়।
- শুরুতে ক্রাচ বা ফ্রেম নির্ভর করে চলাফেরা করলেও পায়ের জোর যেমন যেমন ফিরবে তেমন তেমন ক্রাচ-নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে।
- ব্যায়াম করলে হাঁটু স্টিফ হবে না, কিন্তু ব্যায়াম করার সময় হাঁটুতে চাপ দেওয়া যাবে না।
- অপারেশনের পর ছয় সপ্তাহ বাবু হয়ে বসা যাবে না।
- শোবার সময় হাঁটুর নীচে বালিশ রাখা যাবে না, তাতে হাঁটু স্থায়ী ভাবে বেঁকে যেতে পারে।
- হাঁটুতে মোচড় লাগতে দেওয়া যাবে না।
- বাইরে বেরোনোর জুতো উপযুক্ত হতে হবে।
- অপারেশন হয়েছে যে হাঁটুতে, যতদিন না ডাক্তার বলছেন, ততদিন সে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসা যাবে না।
- বসার সময় পা তুলে বসুন, ফোলা কমাতে বরফের প্যাক ব্যবহার করতে পারেন।

দৈনন্দিন কাজকর্মে বদলানো হাঁটুরও ক্ষয় হয়। বছর ১২ পরে অপারেশন করা হাঁটু বদলানোর দরকার পরে মোটামুটি ৫% রোগীর। পুরো প্রতিস্থাপিত হাঁটু আংশিক প্রতিস্থাপিত হাঁটুর চেয়ে বেশি দিন টেকে।

NHS-এর রোগীদের জন্য তথ্য থেকে ঈষৎ~সংক্ষিপ্ত। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ এম বি বি এস, জেনারেল ফিজিশিয়ান, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।

Advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে--রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০০৯

ফোন-৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

অসহ্য দাঁতের যন্ত্রণা !! ডাক্তারবাবু দাঁত তুলে দিন!!

ডা. মনজুরুল ইসলাম

দাঁত-তোলা দাঁতের একমাত্র চিকিৎসা নয়।

দাঁতের শক্ত অংশটি গঠনগতভাবে তিনটি স্তরে বিভক্ত। বাইরের দিক থেকে দাঁতের ভিতরদিকে এই স্তরগুলি হল—

১. এনামেল।

২. ডেন্টিন।

৩. সিমেন্টাম।

এবং ভিতরের নরম মধ্য অংশ পাল্প দিয়ে তৈরি। পাল্প দাঁতের ক্রাউন থেকে রুট পর্যন্ত বিস্তৃত। পাল্পে থাকে দাঁতের নার্ভ, রক্তজালক, কানেক্টিভ টিসু।

আমরা কেন যন্ত্রণা অনুভব করি?

যখন পাল্পে সংক্রমণ হয়, পাল্পে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায় এবং পাল্পের মধ্যে চাপ বেড়ে যায় তখন আমরা অসহ্য দাঁতের যন্ত্রণা অনুভব করি।

পাল্প কখন সংক্রমিত হয়?

বিভিন্ন কারণে পাল্প সংক্রমিত হয় যেমন দাঁতের ক্যাভিটি, মাড়ীর সমস্যা এবং দাঁতের আঘাতজনিত কারণে।

যখন পাল্প সংক্রমিত হয়, তখন কোনো গরম বা ঠান্ডা বস্তু খাওয়ার সময় অথবা যেকোনো সময় দাঁতে ব্যথা হয়।

কখনো কখনো পাল্প ড্যামেজ হয়ে যায় কিন্তু কোনো যন্ত্রণাও হয় না।

পাল্প সংক্রমণের লক্ষণ:

দাঁতের গোড়ায় ফুলে যাওয়া, পুঁজ জমে যাওয়া, মুখ ফুলে যাওয়া ইত্যাদি।

পাল্প সংক্রমণের চিকিৎসা:

যখন পাল্প ড্যামেজ হয় তখন দাঁতের দু-টি ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে—

১. RCT (রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট)

২. দাঁত তোলা।

রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট কখন করতে হয়?

মেডিক্যাল সায়েন্সে এ বিষয়ে একটা কথা আছে, "Tooth will not heal by itself", তাই দাঁত খারাপ হলে দাঁতের ট্রিটমেন্ট করা খুব প্রয়োজন।

Streptococcus mutans নামক এক ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে দাঁতের অংশ ভেঙে যায়। এবং চারপাশের গঠনগত হাড় ও সাপোর্টিং টিসুকে নষ্ট করে দেয়।

রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করার উদ্দেশ্য হল দাঁতের সংক্রমিত পাল্পকে বার করে দাঁতকে ফের কার্যকর করে তোলা এবং ভবিষ্যতে যাতে দাঁতটিতে কখনো সংক্রমণ না হয় তা নিশ্চিত করা। সবশেষে দাঁতে ক্যাপ বসানো হয় যাতে পুনরায় দাঁতের গঠনগত অংশ না ভাঙে।

রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করতে কতটা সময় লাগে?

রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করতে মোটামুটি ২-৫ সিটিং-এর প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় ১-২ সিটিং-এও করা সম্ভব। সেটা দাঁতের অবস্থা অনুযায়ী ডাক্তার ঠিক করবেন।

রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট-এর পরে করণীয়:

যদিও রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট-এর পর দাঁতের যন্ত্রণা আর থাকে না, কিন্তু রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট শেষে ক্যাপ বসানো খুব প্রয়োজন। কারণ রুট ক্যানাল করা দাঁতের ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, আর ক্যাপ বসালে ভবিষ্যতে ভাঙার সম্ভাবনা থাকে না, দাঁত শক্তপোক্ত থাকে, খাবার চিবোতে অসুবিধা হয় না।

কখন রুট ক্যানাল সম্ভব নয়:

বেশিরভাগ দাঁত রুট ক্যানাল করা সম্ভব, কিন্তু কখনো কখনো কিছু দাঁতে রুট ক্যানাল সম্ভব নয়। যেমন দাঁতের রুট ভীষণভাবে ভেঙে গেলে, বা দাঁতের চারপাশে গঠনগত হাড় ক্ষয়ে গেলে যখন দাঁত নড়তে শুরু করে সেই সময় এই ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব হয় না।

এখনকার সময়ে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার দৌলতে রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট আরও উন্নত এবং স্বল্প সময়ে করা সম্ভব। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. মনজুরুল ইসলাম, বিডিএস, ডেন্টাল সার্জন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস স্পেশালাইজ্‌ড হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার।

Advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুক মার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, বই-চিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

কুঁড়ে চোখ বা একচোখোমি

ডা. দীপংকর জানা

ধরুন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখলেন পূর্ব দিক থেকে সূর্যোদয় আজ হয়নি। ইলেক্ট্রিসিটিও নেই। তাহলে কি আপনি আপনার চেনা পরিচিতদের মুখখানা দেখতে পারবেন?

আরে না, না, সত্যি কি আর সূর্য উঠবে না? সেরকম কিছুই না, আমি শুধু বলতে চাইছি যে আলোর উপস্থিতি ছাড়া আমাদের এই দু-টি চোখ কোনো কাজ করতে পারে না।

তাহলে চোখ কীভাবে কাজ করে একটু বুঝে নেওয়া যাক।

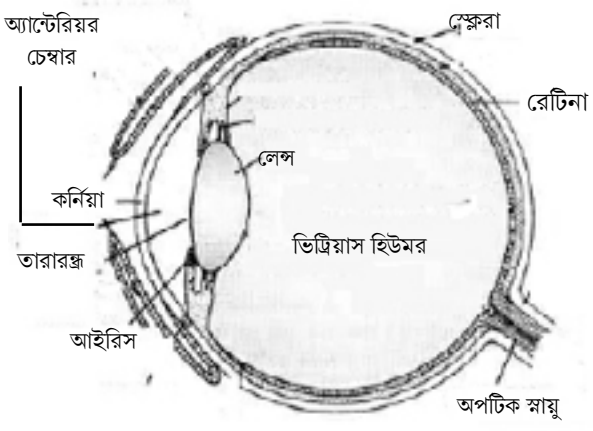

চিত্র ১. মানব চক্ষুর বিভিন্ন অংশ

চোখের একদম সাদা অংশটি, বাইরে থেকে যেটি দেখা যায়, তাকে স্ক্লেরা (Sclera) বলে আর সাদা অংশের মধ্যেকার গোল কালো অংশকে কর্নিয়া (Cornea) বলে। এই কালো অংশের মধ্যকার সবচেয়ে গাঢ় কালো রং-এর অংশকে পিউপিল (Pupil) বা তারারন্ধ্র বলে।

বললাম বটে কালো অংশকে কর্নিয়া বলে, আসলে কর্নিয়া মোটেই কালো নয়। কর্নিয়া হল স্বচ্ছ। সাদা স্ক্লেরার মাঝখানে যেন গোল করে কাটা একটা জায়গা, আর সেখানে স্বচ্ছ কাচের মতো কর্নিয়াকে একেবারে নিখুঁত করে খাপে খাপে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু তাহলে ওই কর্নিয়ার জায়গাটা কালো দেখায় কেন? সবসময় যে কালোই দেখায় তা নয়, কারও চোখ বাদামি, কারও সবুজ, কারও-বা পিঙ্গল। এই রংগুলো হল কর্নিয়ার ঠিক তলায় থাকা 'আইরিস' বা গোল অস্বচ্ছ এক পর্দাবিশেষ, আর সেই পর্দার মাঝখানে ছোটো সম্প্রসারণশীল ফুটো হল পিউপিল বা নেত্ররন্ধ্র।

পিউপিল আর আইরিস পর্দার ঠিক পেছনে (anterior chamber) সামান্য একটু জলীয় জিনিস থাকে। তার পেছনেই চোখের লেন্সের (Lens) অবস্থান। লেন্সের পেছনে আছে কিছু অর্ধতরল সান্দ্র পদার্থ (vitreous humor), এবং সবার পিছনে ভিতরের দিকে থাকে রেটিনা (Retina)। একটি স্নায়ু এখান থেকে দৃশ্যের সংবেদন বহন করে। সেই স্নায়ুর নাম অপটিক নার্ভ (Optic Nerve)।

আমাদের চোখ আর মস্তিষ্কের মধ্যে সম্পর্কটা খুবই গভীর। এই অপটিক নার্ভ আবার মস্তিষ্কের পিছনের দিকে টেম্পোরাল লোব (Temporal Lobe)-এ গিয়ে শেষ হয়।

বুঝতে পারছেন না তো, তাহলে আমরা কীভাবে দেখতে পাই। আলো যখন কোনো জিনিসের উপর পড়ে সেই জিনিসটা থেকে কিছু পরিমাণ আলো প্রতিফলিত হয় (Reflection)। সেই প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে, তা সবচেয়ে গাঢ় কালো (পিউপিল বা তারারন্ধ্র) অংশের মধ্যে দিয়ে চোখের লেন্সের উপর পড়ে, সেখান থেকে আলো আবার রেটিনাতে এসে পড়ে। রেটিনাতে কিছু কোশ (ইংরাজিতে বলে রড কোশ ও কোন কোশ) এই আলোর সংকেতকে বৈদ্যুতিক (Electric) সংকেতে পরিণত করে।

এই বৈদ্যুতিক সংকেত অপটিক নার্ভ দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছোয়। এখানে ছবি তৈরি হয় যা আমরা দেখতে পাই। তবে এই ঘটনা দু-টি চোখ দিয়ে একইসঙ্গে একইরকমভাবে ঘটে।

শিশুদের ক্ষেত্রে এই অংশগুলি মায়ের পেটের মধ্যে থাকাকালীন তৈরি হতে শুরু করে, তবে জন্মানোর পরও অপরিণত অবস্থায় থাকে। এটা একটি সাধারণ ঘটনা, মোটামুটি শিশুর ৬ বছর বয়স পর্যন্ত এটি তৈরি হতে সময় লাগে। তারপর থেকে পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি থাকে। তবে এমত অবস্থাতেও দু-টি চোখ ও তাদের কাজ করার মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকা উচিত, তা না হলেই গণ্ডগোল শুরু হয়। মানে যদি একটি চোখের দৃষ্টি সেই বয়সের তুলনায় সঠিক থাকে আর অন্যটি যদি কম হয়, আমাদের মস্তিষ্ক দু-টি চোখ দিয়ে দুইরকম ছবি তৈরি করে এবং এদের মধ্যে যেটি বেশি স্পষ্ট সেটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে আর অন্যটিকে ক্রমাগত অবহেলা করে।

এ-রকম ঘটনা যদি অনেকদিন ধরে চলতে থাকে তবে কম দৃষ্টিযুক্ত চোখের দৃষ্টি আরও কমতে থাকে। উপরের ঘটনাটি যদি কোনোরকম কারণ ছাড়াই হয় তাহলে তাকে আমরা অ্যামব্লায়োপিয়া (Amblyopia) বলি। আর যে চোখটা কমজোরি, যার পাঠানো ছবি মস্তিষ্ক গ্রহণ করছে না, সেটাকে 'অলস চোখ' বা লেজ়ি আই (Lazy Eye) বলে থাকি।

আপনার শিশুর এ-রকম দুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে কি?

এটা বোঝা খুবই কঠিন। তবে একটু বড়ো বাচ্চা হলে তারা তাদের জিনিসপত্র নজর করার ভঙ্গিমাতে বা কাজ করতে অসুবিধা লক্ষ করে এর সম্ভাবনা আন্দাজ করা যায়। একেবারে ছোটো শিশুদের ক্ষেত্রে এটা বোঝা বেশ কঠিন। তবে যদি পরপর দু-টি চোখ (যাদের একটি ভালো আর অন্যটি খারাপ) হাত দিয়ে কিছুক্ষণ এক-এক করে ঢেকে রাখা যায়, তখন দেখা যাবে যে ভালো চোখ হাত দিয়ে ঢাকলে শিশুটি হাত সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। খারাপ চোখটি হাত দিয়ে ঢাকলে শিশু সেই হাত সরানোর তত চেষ্টা করে না, কারণ তার দেখতে তেমন অসুবিধা হয় না। এই পরীক্ষা থেকে শিশুর খারাপ দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

কোনো কারণ ছাড়াই কি লেজ়ি আই (Lazy Eye) হতে পারে?

চিত্র ২. স্কুইন্ট বা স্ট্রাবিসমাস

অনেকসময় লেজ়ি আই (Lazy Eye) বিভিন্ন কারণের জন্যও তৈরি হয়।

১. Squint (Strabismus): গ্রামেগঞ্জে ট্যারা চোখ বলে আখ্যা দিয়ে থাকলেও আসলে চোখের গঠনগত সমস্যার জন্য এ-রকমটি ঘটে। এক্ষেত্রে চোখটি তার সাধারণ অবস্থান থেকে উপরে, নীচে, বাইরে, ভিতরে, ডানদিক বা বাঁ-দিকে অবস্থান করে। অন্য চোখটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকে।

২. Refraction Error (চোখের 'পাওয়ার'-এর সমস্যা): হ্যাঁ, বড়োদের মতো ছোটো শিশুদেরও চোখের Power-এ সমস্যা থাকতে পারে। এবং তা যদি একটি চোখে অনেকদিন ধরে থাকে, অন্যটি তুলনায় অনেক বেশি ভালো থাকে, সময়ে উপযুক্ত চশমার ব্যবস্থা না করলে লেজ়ি আই-এর মতো অবস্থা তৈরি হয়।

চোখের রিফ্র্যাকটিভ এরর বা চশমার পাওয়ার

সাধারণত আলো সমান্তরালভাবে আমাদের চোখের ভিতরে প্রবেশ করে। সেখানে চোখের লেন্সের সাহায্যে (আমাদের চোখের লেন্স উত্তল, যা কিনা সমান্তরাল আলোকে একটি বিন্দুতে মিলিত হতে সাহায্য করে) রেটিনাতে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয়। রিফ্র্যাকটিভ এরর-এর ফলে, যদি এই মিলিত বিন্দু রেটিনার সামনে হয় তখন আমরা কাছের জিনিস মোটামুটি দেখতে পেলেও দূরের জিনিস দেখতে বেশ অসুবিধা হয়। একে Shortsightness বা

চিত্র ৩. মায়োপিয়া ও হাইপারমেট্রোপিয়া

মায়োপিয়া (Myopia) বলে। রিফ্র্যাকটিভ এরর-এর ঠিক উলটো জিনিসটা ঘটলে, অর্থাৎ সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোকরশ্মি চোখের রেটিনার পেছনের কোনো বিন্দুতে মিলিত হবার প্রবণতা হলে দূরের জিনিস মোটামুটি দেখতে পেলেও কাছের জিনিস দেখতে বেশ অসুবিধে

হয়। একে Long sightness বা হাইপারম্যাট্রোপিয়া (Hypermetropia) বলে।

আবার অনেকসময় মসৃণ কর্নিয়া অমসৃণ হয়ে গেলে সমান্তরাল আলোকরশ্মিগুচ্ছর মিলিত হওয়ার অনেকগুলি আলাদা আলাদা বিন্দু তৈরি হয়, একে অ্যাস্টিগম্যাটিস্‌ম (Astigmatism) বলে।

৩. জন্মের সময় থেকে যদি লেন্স সাধারণ অবস্থার চেয়ে ঘোলাটে রকমের হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আলো পুরোপুরি চোখের মধ্যে প্রবেশ করতে বেশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। একে জন্মগত ছানি পড়া বা Congenital Cataract বলে। তাতেও ছানিপড়া চোখটি 'লেজ়ি আই' হয়ে যাবার প্রভূত সম্ভাবনা।

৪. কোনো কারণে চোখের উপরের পাতা যদি অনেকটাই নীচে নেমে আসে তখন আলো প্রবেশ পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই ঘটনা থেকে 'লেজ়ি আই' হতে পারে, এবং ঘটনাটিকে ইংরাজিতে টোসিস (Ptosis) বলে। এর ঠিকমতো বাংলা প্রতিশব্দ নেই, আমরা একে 'চোখের পাতা নেমে আসা' বলতে পারি।

তাহলে রোগ নির্ধারণের উপায়

লেজ়ি আই-এর ক্ষেত্রে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগ নির্ধারণ করা যায় ততই ভালো, শিশুটির তত বেশি দৃষ্টিশক্তির উন্নতি সম্ভব। মোটামুটি শিশুর ৬ বছর বয়সের পরে লেজ়ি আই আছে এটা ধরা পড়লে, চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি উন্নতি হওয়া একটু কঠিন।

যেভাবে আমরা এটাকে এড়াতে পারি তা হল:

☞ প্রথমত জন্মের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রথমবারের মতো চোখ পরীক্ষা করা। এ-রকম পরীক্ষার মাধ্যমে ছানি পড়ার মতো অবস্থা থাকলে ধরা পড়ে এবং তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করা সম্ভব।

☞ ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে শিশুর চোখ উজ্জ্বল আলো অনুকরণের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার চক্ষু পরীক্ষা করা উচিত। শিশুর চোখের দৃষ্টিশক্তি উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে মোটামুটি ৬ মাস বয়সে দূরের ও কাছের বস্তুকে ফোকাস (focus) করতে সক্ষম হওয়া, ১২ মাস বয়সে ছোটো বস্তুকে দেখতে পাওয়া, খাদ্যের কণাকে চিনতে পারা এবং বাড়ির লোকজনের মুখ চিনতে পারা, ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা সম্ভব। তবে ৪-৫ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে আরও একবার চক্ষু পরীক্ষা করা উচিত।

তাহলে চিকিৎসার বিভিন্ন পর্যায় কী?

লেজ়ি আই-এর মতো অবস্থা চিকিৎসা করার জন্য যে সবসময় চক্ষু বিশেষজ্ঞের (eye specialist) কাছে পৌঁছোতে হবে তা নয়। প্রাথমিকভাবে অপ্টোমেট্রিস্ট, যাঁরা চোখের চশমা দিতে প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান (ডাক্তার বা চক্ষুবিশেষজ্ঞ নন), চক্ষু পরীক্ষা করে বলতে পারবেন রিফ্র্যাকটিভ এরর কিছু আছে কিনা। থাকলে, তার চিকিৎসা করাতে হবে, চশমা লাগবে খুব সম্ভবত। এর ফলে আবার Squint-এর (যাকে চোখ ট্যারা বলা হয়) মতো সমস্যা অনেক সময় নিজে থেকে ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অনেকসময় অবহেলিত চোখের দৃষ্টিশক্তি উন্নতি লাভের জন্য ভালো চোখে বাইরে থেকে একটা কালো কাপড় (Patch) লাগিয়ে অবহেলিত চোখ দিয়ে জোর করে দেখতে বাধ্য করার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে শিশুকে অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন। তবে এ-রকম চিকিৎসা যদি অনিয়মিতভাবে করা হয় তাহলে কিন্তু উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম থাকে।

➢ যদি ছানির মতো সমস্যা বা ট্যারাভাব (Squint)-এর মতো সমস্যা থাকে তাহলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয়, এবং অপারেশনের মাধ্যমে উন্নতি করা হয়।

➢ চোখের ওপরের পাতা পড়ে আসা (Ptosis)-র মতো অবস্থা যা আলোর প্রবেশ পথে বাধা তৈরি করে লেজ়ি আই তৈরি করতে পারে, তাতে বেশিরভাগ সময় অপারেশনের মাধ্যমে চোখ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

➢ Atropine জাতীয় আই ড্রপ ব্যবহার করার মাধ্যমে ভালো চোখের দৃষ্টিশক্তিকে অস্পষ্টতা তৈরি করে দু-টি চোখের মধ্যে সাদৃশ্য বজায় রাখার মাধ্যমেও অনেকসময় চিকিৎসা করা হয়।

সর্বোপরি সচেতনতাই পারে আপনার শিশুর ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করতে। সাহায্যের জন্য না হয় আমরা থাকলামই। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. দীপংকর জানা, এমবিবিএস, একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা প্রসঙ্গে কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা

ডা. বিষাণ বসু

না, দু-জনের সম্মতি থাকলে, সমকাম আর অপরাধ নয়। শুনেছিলাম, যব মিয়াঁ বিবি রাজি, তব কেয়া করেগা কাজি। তবুও, রাষ্ট্র নাক গলানোর চেষ্টার কসুর করেনি।

বৃহস্পতিবার, ৬ সেপ্টেম্বর, এক ঐতিহাসিক রায়ে, প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ জানালেন, না, দু-জন রাজি থাকলে, কাজির নাক গলানো অন্যায়।

অর্থাৎ, রাষ্ট্রশক্তির অন্যতম স্তম্ভ, জুডিশিয়ারিই জানিয়ে দিলেন, দু-জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ব্যক্তিগত যৌনতার পরিসরে, রাষ্ট্রের অযথা মাতব্বরি সংবিধানস্বীকৃত অধিকারের পরিপন্থী। এও এক উলটপুরাণ বই কী!!

আর, এই রায়ের অভিঘাত এমনই, যে, শাসকদলের বড়ো-মেজো-সেজো কোনো নেতার তরফেই, এখনও পর্যন্ত, কোনো স্বাগত বার্তা এসে পৌঁছায়নি। তাই, আসুন, একপক্ষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস আর অন্যদিকে বাঙ্ময় নীরবতা, এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা রায়টিকে উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁটিয়ে পড়ি।

. . . অনেক অনেক বছর ধরে জারি থাকা এক বদ্ধ জলাশয়, ভিক্টোরিয়ান নীতিধারণার সাথে উপনিবেশের জটিল মিশেলে তৈরি এক অপধারা বাতিল করলেন মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট, . . .

এককথায় বলা যায়, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বাতিল করে, অনেক মানুষের জীবনে, একঝলক মুক্ত বাতাস বইয়ে দিলেন সর্বোচ্চ আদালত। তার সাথে ছুঁড়ে দিলেন, একগুচ্ছ মন্তব্য, যাদের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

অনেক অনেক বছর ধরে জারি থাকা এক বদ্ধ জলাশয়, ভিক্টোরিয়ান নীতিধারণার সাথে উপনিবেশের জটিল মিশেলে তৈরি এক অপধারা বাতিল করলেন মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট, সব বিচারেই তা ঐতিহাসিক বই কী! নাকি কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন এক সভ্যতার উত্তরাধিকার নিজের বলে দাবি করতে হলে, এইটুকু আধুনিকতার বোধ নিতান্তই স্বাভাবিক?

এমন আশ্চর্য মুহূর্তে, এই ধারার শিকার হয়ে, অপমানিত-নিগৃহীত হয়ে, অবমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছেন যে কয়েক প্রজন্মের কিছু মানুষ, তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মাননীয় বিচারপতি এই রায়ের তাৎপর্যকে সঠিক প্রেক্ষিত দিলেন।

আইনের ৩৭৭ ধারা নাকচ করতে গিয়ে জাস্টিস ইন্দু মালহোত্রা বললেন,

"History owes an apology to the members of this community and their families, for the delay in providing redressal for the ignominy and ostracism that they have suffered through the centuries.

The members of this community were compelled to live a life full of fear of reprisal and persecution. This was on account of the ignorance of the majority to recognise that homosexuality is a completely natural condition, part of a range of human sexuality.

The misapplication of this provision denied them the Fundamental Right to equality guaranteed by Article 14. It infringed the Fundamental Right to non-discrimination under Article 15, and the Fundamental Right to live a life of dignity and privacy guaranteed by Article 21. The LGBT persons deserve to live a life unshackled from the shadow of being 'unapprehended felons.'"

আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ একদিন এক আলোচনায়, ভিন্ন প্রসঙ্গে, বলেছিলেন, আইনের বইখানা তো তেমন বড়োসড়ো নয়। কিন্তু, আসল কথা আইনের ইন্টারপ্রিটেশন। অনেক পড়াশোনা, জীবনের অভিজ্ঞতা, আইন ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য, এই মিলিয়েই আসে কিছু ল্যান্ডমার্ক রায়। আর, সেই বিদগ্ধ অনুভবের ছায়া ধরা পড়ে রায়ের সাথে বিচারপতির মন্তব্যে।

না, এক্ষেত্রে ধারা বা আইনের ইন্টারপ্রিটেশন নয়। দণ্ডবিধির আস্ত একটি ধারাকে, সাম্য ব্যক্তিস্বাধীনতা নাগরিকের নিজস্ব পছন্দের সংবিধানস্বীকৃত অধিকারের পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে, সেই ধারা বাতিলের এই রায়ও তেমনই ল্যান্ডমার্ক।

সংখ্যালঘুর সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা জানালেন,

"The mere fact that the LGBT persons constitute a 'miniscule fraction' of the country's population cannot be a ground to deprive them of their Fundamental Rights guaranteed by Part III of the Constitution . . .

Under the Constitutional scheme, while the majority is entitled to govern; the minorities like all other citizens are protected by the solemn guarantees of rights and freedoms under Part III."

সর্বোচ্চ আদালত জানালেন, দণ্ডবিধির এই ৩৭৭ ধারা, আমাদের সংবিধানের আর্টিকল ১৫-র সরাসরি পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছে, লিঙ্গের ভিত্তিতে অসাম্য অসাংবিধানিক। জাস্টিস ইন্দু মালহোত্রা ব্যাখ্যা করলেন,

"Sex as it occurs in Article 15, is not merely restricted to the biological attributes of an individual, but also includes their 'sexual identity and character'."

প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র সংবিধানের একটি সময়োপযোগী চলিষ্ণু আধুনিক ভাষ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বললেন,

"This doctrine invariably reminds us about the living and dynamic nature of a Constitution. Edmund Burke, delineating upon the progressive and the perpetual growing nature of a Constitution, had said that a Constitution is ever-growing and it is perpetually continuous as it embodies the spirit of a nation. It is enriched at the present by the past experiences and influences and makes the future richer than the present."

প্রায় দু-হাজার বছর আগে, মানুষের বদ্ধমূল ভালো-মন্দ ঠিক-বেঠিক সুন্দর-অসুন্দরের ধারণা, আর তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই সংস্কারের ভূমিকা প্রসঙ্গে, গ্রিক দার্শনিক এপিকটেটাস বলেছিলেন,

"Is it possible, then, that each of you apply your preconceptions correctly on the very subjects about which you have contradictory opinions?

It is not.

So do you have anything to show us for this application, preferable to its seeming so to you? And does a madman act any otherwise than it seems to him right? Is this, then, a sufficient criterion for him too?

It is not.

Come, therefore, to something preferable to what seems."

Epictetas, *What the Beginning of Philosophy Is* (Discourses)

হ্যাঁ, কথাগুলো আজও প্রাসঙ্গিক। তাই, এই একবিংশ শতকেও,

. . . রাষ্ট্রের হাতে একটি জামা রয়েছে। আপনাকে, যেমন করেই হোক, সেই জামার মাপে মানানসই হতে হবে। পারলে ভালো। আপনি দেশপ্রেমিক, সুনাগরিক। না পারলে, আপনি শত্রু, পাকিস্তানের চর, ঘৃণ্য, অপরাধী, মাওবাদী। . . .

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি জাস্টিস চন্দ্রচূড়কে বলতে হয়,

"What is 'natural' and what is 'unnatural'? And who decides the categorization into these two ostensibly distinct and water-tight compartments?"

হ্যাঁ, রাষ্ট্রের হাতে একটি জামা রয়েছে। আপনাকে, যেমন করেই হোক, সেই জামার মাপে মানানসই হতে হবে। পারলে ভালো। আপনি দেশপ্রেমিক, সুনাগরিক। না পারলে, আপনি শত্রু, পাকিস্তানের চর, ঘৃণ্য, অপরাধী, মাওবাদী। এই জামায় না আঁটলে, আপনার হাঁসফাঁস লাগলেও উপায় নেই। রাষ্ট্রশক্তির সামনে একক আপনি তো ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র। আর, সমস্যা এইটাই, যে এই জামাটার মাপ ক্রমশই ছোটো করা হতে থাকে। মানাতে গিয়ে আপনিও ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকেন। নিয়ম মেনে চলার এই খেলাটায়, আপনি যখন ক্লান্ত, তিতিবিরক্ত, তখন আবিষ্কার করেন, আপনি একদম একা, আর আশেপাশে কিছু যন্ত্রমানব।

আপাতত, নিয়ম ছিল এই, সমকামী আপনি ঘৃণ্য অপরাধী। না, আর নয়। শিক্ষকদিবসের পরেই, সর্বোচ্চ আদালত, যে রায় দিয়েছেন, তা এক গভীর শিক্ষার সমতুল্য।

চারপাশে ফ্যাসিবাদের অবাধ অন্ধকারের মধ্যে, একটা জানালা খুলে আকাশ দেখানো। এই রায়, তাই, ঐতিহাসিক। আর, এর সঙ্গে, জাস্টিস চন্দ্রচূড়ের এই মন্তব্যের ব্যঞ্জনা গভীরতর,

"Do we allow the state to draw the boundaries between permissible and impermissible intimacies between consenting adults?"

ব্যক্তিজীবনের কোনো পরিসরেই আমরা কি রাষ্ট্রের নাক গলানো মেনে নেব তাহলে? ধর্মাচরণ? বা খাদ্যাভ্যাস?

ভিক্টোরীয় নীতিবোধ, যৌনতা বিষয়ে ক্রিশ্চান ছুঁতমার্গ আর

ঔপনিবেশিক দমননীতি। তিনের আজব মিশেলজাত দেড়শো বছরেরও আগের এই দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা। আশ্চর্য এই, যে অতীতচারী বর্তমান শাসকেরাও এই ধারাই পছন্দ করেন, যদিও আমাদের উজ্জ্বল অতীতে, যৌনতা নিয়ে রাখঢাক ছিল না কোনোদিনই।

এই দেশেই, গৌরবের সেই সময়ে, মহর্ষি বাৎস্যায়ন কামসূত্র লিখে গিয়েছেন, হ্যাঁ, আজ থেকে প্রায় হাজার-দুয়েক বছর আগেই। কিন্তু, ধ্বজাধারীরা আমাদের নতুন করে ইতিহাস শেখাচ্ছেন। জানাচ্ছেন, যৌনতা পশ্চিমি অনুকরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

সমাজের অনেক অংশেই, তাঁরা নিজস্ব নৈতিকতার বোধটি চারিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। সামাজিক মর‍্যালিটির, আমাদের অতীত ইতিহাসের মতোই, পুনর্লিখনের প্রক্রিয়াটি জারি হয়েছে, যেমনটি ফ্যাসিবাদে হয় আর কী!

এই ৩৭৭ ধারা সমর্থন করতে, বাৎস্যায়নের দেশে, এই একবিংশ শতকেও, কোর্টে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, যৌনতার একমাত্র উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন। সমকাম, একারণেই, অন্যায়। আহা! তাহলে তো, কন্ডোম বা গর্ভনিরোধক বড়ি, দুই-ই বেআইনি করতে হয়।

কিন্তু, এই সামাজিক নীতিশিক্ষা যে খুব সহজে, বিনা বাধায় আইন বা দণ্ডবিধির জায়গা নিতে পারবে না, সর্বোচ্চ আদালত আমাদের নিশ্চিন্ত করলেন।

প্রধান বিচারপতি জাস্টিস দীপক মিশ্র জানালেন,

" . . . it is for the constitutional courts to ensure, with the aid of judicial engagement and creativity, that constitutional morality prevails over social morality."

আঃ, আশ্বস্ত হলাম।

বিচারপতি চন্দ্রচূড় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান,

"Sexuality cannot be construed as something that the State has the prerogative to legitimize only in the form of rigid, marital procreational sex . . . "

আশা করি, আমাদের ব্যক্তিগত স্পেসের বাকি উপাদানগুলিও, এমন করেই, রাষ্ট্রীয় মাতব্বরির বাইরে থাকতে পারবে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের নাগপাশ তো সব স্পেস সংকুচিত করে দম বন্ধ করে দিচ্ছে।

"The self-determination of sexual orientation is an exercise of autonomy."

আশা করি, আমাদের ব্যক্তিগত স্পেসের বাকি উপাদানগুলিও, এমন করেই, রাষ্ট্রীয় মাতব্বরির বাইরে থাকতে পারবে। ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের নাগপাশ তো সব স্পেস সংকুচিত করে দম বন্ধ করে দিচ্ছে।

আমাদের আত্মপরিচয়ের বিভিন্ন স্তরের সাথেই গভীরভাবে জড়িয়ে আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা। একটি বিশেষ পরিচয়ে আটকে রাখতে পারলে, রাষ্ট্রের পক্ষে আমাদের ব্যবহার করে নিতে সুবিধে হয়। যেমন, ধরুন, একবার আমাকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু ভারতীয়, এই গণ্ডিতে পরিচিত করতে পারলেই, আমি এক ধাক্কায় কতজন মানুষকে শত্রু ঠাউরে ফেলতে পারি!! কিন্তু, একবার আমি যদি অনুভব করতে পারি, যে আমার এই বেঁচে থাকা বহুমাত্রিক, অনেক ভিন্ন পরিচয় মিলিয়েই আমি একখানা সম্পূর্ণ মানুষ, তাহলে আমার বন্ধুবৃত্ত বেড়ে যায়, আপনার সাথে আমার কথোপকথনের একটা কমন স্পেস তৈরি হয়, এক কথায় আমি আপনাকে শত্রু জেনে তেড়ে যেতে পারি না।

এই বহুমাত্রিকতা বোঝাতেই অমর্ত্য সেন, স্বভাবসিদ্ধ সরস ভঙ্গিতে বলেছেন,

"The same person can be, without any contradiction, an American citizen, of Caribbean origin, with African ancestry, a Christian, a liberal, a woman, a vegetarian, a long-distance runner, a historian, a schoolteacher, a novelist, a feminist, a heterosexual, a believer in gay and lesbian rights, a theatre lover, an environmental activist, a tennis fan, a jazz musician, and someone who is deeply committed to the view that there are intelligent beings in outer space with whom it is extremely urgent to talk (preferably in English). Each of these collectivities, to all of which this person simultaneously belongs, gives her a particular identity." (*Identity & Violence*)

কিন্তু, এমন বহুত্ববাদী নাগরিক নিয়ে, রাষ্ট্রের ভারি অসুবিধে। সে চায়, ভালো-মন্দ ঠিক-বেঠিকের সাদা-কালো দুনিয়াদৃষ্টি। তাই,

. . . এক কলমের খোঁচায় যদি রাষ্ট্রের সামনে সুযোগ থাকে আপনার একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে নজর রাখার, অথবা আপনাকে বিনা বাক্যব্যয়ে ক্রিমিনাল প্রতিপন্ন করার, আপনিই বলুন, সরকার চাইবেন সেই সুযোগ হারাতে? . . .

"The imposition of an allegedly unique identity is often a crucial component of the 'martial art' of fomenting sectarian confrontation." (*Identity & Violence*)

তাই, একমাত্রিক পরিচিতি গড়ে নিয়মের নিগড়ে বাঁধার প্রয়াস শুরু হয় উপনিবেশে। দিন বদলায় না স্বাধীনতার পরেও। দণ্ডবিধির এই ধারার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জাস্টিস চন্দ্রচূড় বলেন,

"So abominable did Macaulay consider these offences that he banished the thought of providing a rationale for their being made culpable . . .

A charter of morality made their relationships hateful. The criminal law became a willing instrument of repression . . . The offence would be investigated by searching the most intimate of spaces to find tell-tale signs of intercourse. Civilisation has been brutal."

. . . এক বিশেষ ধর্মাচরণ বা একটি বিশেষ ধাঁচের জীবনযাত্রাকে সাংস্কৃতিক মূলস্রোত ঠাউরে, বাকি সবাইকে অপর বানিয়ে অপরাধী সাজানোর প্রবণতার বিরুদ্ধে, এই রায়, বিচারপতিদের এই পর্যবেক্ষণ, মন্তব্য, প্রায় চপেটাঘাত।

আর যেমন বলেছিলাম, দমনপীড়নের সুযোগ কোন রাষ্ট্রশক্তিই-বা হাতছাড়া করতে চায়! তাই, স্বাধীন দেশেও জারি থাকে ঔপনিবেশিক কণ্ঠরোধকারী দণ্ডবিধি।

এক কলমের খোঁচায় যদি রাষ্ট্রের সামনে সুযোগ থাকে আপনার একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে নজর রাখার, অথবা আপনাকে বিনা বাক্যব্যয়ে ক্রিমিনাল প্রতিপন্ন করার, আপনিই বলুন, সরকার চাইবেন সেই সুযোগ হারাতে?

তাই, আপনি সমকামী হন বা না হন, এই রায় বহুত্ববাদের পক্ষে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার পক্ষে, নিজস্ব পরিসর অক্ষুণ্ণ রাখার অধিকারের স্বপক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে এক ঐতিহাসিক রায়।

হ্যাঁ, সমকাম একজন মানুষের বহুমাত্রিক আইডেন্টিটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, নিজস্ব যৌনসাথি পছন্দের অধিকার, সমলিঙ্গের মানুষকে ভালোবাসার অধিকার।

প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র একদম সঠিক স্থানেই আঘাত হানেন, যখন তিনি বলেন,

" . . . it has to be appreciated that homosexuality is something that is based on sense of identity . . . That is why it is his/her natural orientation which is innate and constitutes the core of his/her being and identity."

আমাদের দেশের, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে, গণতন্ত্র প্রসঙ্গে বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের পর্যবেক্ষণের অভিঘাত নিশ্চিতভাবেই এই রায় ছাপিয়ে সুদূরপ্রসারী।

"Democratic as it is, our Constitution does not demand conformity. Nor does it contemplate the mainstreaming of culture. It nurtures dissent as the safety valve for societal conflict. Our ability to recognise others who are different is a sign of our own evolution. We miss the symbols of a compassionate and humane society only at our peril."

হ্যাঁ, এক বিশেষ ধর্মাচরণ বা একটি বিশেষ ধাঁচের জীবনযাত্রাকে সাংস্কৃতিক মূলস্রোত ঠাউরে, বাকি সবাইকে অপর বানিয়ে অপরাধী সাজানোর প্রবণতার বিরুদ্ধে, এই রায়, বিচারপতিদের এই পর্যবেক্ষণ, মন্তব্য, প্রায় চপেটাঘাত।

এমন অস্থির সময়ে, যখন গণতন্ত্রের দুই স্তম্ভ ব্যর্থ, যখন পার্লামেন্ট প্রায় "শুয়োরের খোঁয়াড়" আর মিডিয়া সর্বার্থেই ধামাধরা, তখন সর্বোচ্চ আদালত আমাদের সম্বিত ফেরালেন। জানালেন, এখনও এই দেশে জানালা খুলে দেওয়া যায়।

প্রিয় কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর একটা কবিতা মনে পড়ে যাচ্ছে,

"দিনগুলো, কেমন চাকার মতো
অযথা আমাকে
পিষে যায় . . . ।
বাস থেকে নেমে মনে হলো
বিদেশেই আছি। তবু
কে ওই মেয়েটি?
আমাদের
ঘরের মেয়ের মতো মনে হয়।
হয়তো মিনুর বোন হবে। এসো,
সুসংবাদ এসো -
আর কোনো ইচ্ছে নেই, শুধু ওই
মেয়েটির সঙ্গে যেন
আমাদের
তরুণ কবির বিয়ে হয়।"
(এসো, সুসংবাদ এসো)

হ্যাঁ, তরুণ কবি যদি মহিলা হন, তাহলেও তিনি যেন স্বচ্ছন্দে মিনুর বোনের সাথে ভালোবেসে থাকতে পারেন।

চাকার মতো পিষে যাওয়া এই দুঃসহ সময়েও, অতএব, এসো, সুসংবাদ এসো। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. বিষাণ বসু, এমবিবিএস, এমডি, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ, একটি সরকারি হাসপাতালে সহযোগী অধ্যাপক।

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। “সন্দীপ্তাকে মনে রেখে” মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে “মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন”।

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

পর্ব সতেরো

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

‘ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে’ পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে,২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপির অনেক-আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

পুববাংলায় ঠাঁই-এর আশায়

বিকেলে আমরা বড়ো নৌকো ছেড়ে একটা ছোটো নৌকোয় চড়লাম। নৌকোটা একটা বিলের ভেতর দিয়ে চলছিল; সন্ধে নাগাদ একটা গাঁয়ের কাছে এসে থামল। আমরা নৌকো থেকে নামলাম। কিছুদূর হাঁটতেই চোখে পড়ল একটা পাকা দালানবাড়ি। আমরা সেখানে পৌঁছোতেই বেশ কয়েকজন বয়স্কা বিধবা মহিলা এগিয়ে এলেন। কালী বলল: ‘এঁরা সকলেই আমার ঠাকমা-দিদিমা, খুড়িমার মা।’ আমি প্রত্যেকের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। বৃদ্ধারা রঙ্গতামাশা জুড়ে দিলেন: ‘এই কি তোমার নতুন কনে নাকি?’ একরাশ অস্বস্তিতে, লজ্জায় কালীচরণ একহাত জিভ বার করে ফেললে। বলে উঠল: ‘না, না, অমন কথাটি বোলো না, ও বেচারি মনে কষ্ট পাবে। চোখের মাথা কি খেয়েছ, দেখতে পাচ্ছ না, ও একটা অসহায় বিধবা; ঘোর সংকটে পড়ে এখানে এসেছে। পরে সব বলব তখন শুনো। আমার বউটাকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছ তো নাকি?’ বৃদ্ধারা একসঙ্গে হেসে উঠে বললেন: ‘নতুন-কনে একটা যখন নিয়েই এসেছ, তখন পুরোনোটার আর দরকার কি বাপু?’ কালী বলল: ‘বেশ,

ওকে ছাড়া তোমাদের যদি চলে যায়, তো ভালো কথা।’

এরপর কালীর বোন বিমলা, বছর পনেরো-ষোলোর একটি মেয়ে আমার হাত ধরে আর-একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে খানিক জিরিয়ে নেওয়ার পর সে আমাকে নিয়ে চলল পুকুরঘাটে। বেশ করে হাত-পা ধুয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। বিমলা আমাকে তারপর ঘুরে ঘুরে তাদের বাড়ি দেখাতে লাগল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু মায় দরজা-জানলা পর্যন্ত দেখাতে দেখাতে অনর্গল বলে যেতে থাকল—এটা কী, ওটা কেন—এইসব। এরপর সে আমাকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। সেখানে আলাপ করিয়ে দিল এক ফুটফুটে সুন্দরী এয়োস্ত্রীর সঙ্গে: ‘ইনি সোনা দাদার বউ। ঠাকুর ভাইয়ের বউ গেছেন বাপের বাড়ি।’ জিগেস করলাম: ‘কে ঠাকুর ভাই?’ বিমলা বলল: ‘যাঁর সঙ্গে তুমি এসেছ।’ ওর পরিবারে কথা জিগেস করায় জানতে পারলাম, ওর দু-ভাই, এক বোন। যে মেয়েটি মশলা বাটছে, সে ওর বোন মুক্তি। ওখানে একটি মেয়ে তার মা আর বোনের সঙ্গে বসেছিল। ওরা ও-বাড়িতে মুনিষের মতো গায়ে-গতরে খাটে।

মেয়েটির বিয়ে হয়েছে এক চাকরের সঙ্গে। শেষমেষ বিমলা আমাকে নিয়ে গেল তার মায়ের কাছে। দেখলাম, অসাধারণ সুন্দরী এক মাঝবয়েসি বিধবা বসে বসে দুধ জাল দিচ্ছেন। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। ঘোমটা সরিয়ে তিনি আমাকে দেখলেন, কোমল স্বরে বললেন: 'বোসো বাছা, এইখানে।' বসে পড়লাম তাঁর পাশে।

পিল পিল করে লোক আসতে লাগল শুধু আমাকে একটিবার দেখার জন্যে; যেন আমি কী-একটা দেখবার জিনিস, চিড়িয়াখানার বাঘ-সিংগি বিশেষ! কী উটকো ঝামেলারে বাবা! রাতেও যে একটু

পিল পিল করে লোক আসতে লাগল শুধু আমাকে একটিবার দেখার জন্যে; যেন আমি কী-একটা দেখবার জিনিস, চিড়িয়াখানার বাঘ-সিংগি বিশেষ! কী উটকো ঝামেলারে বাবা!

একলা থেকে জিরিয়ে নেব, তার জো নেই। তখনও লোকে আমাকে রেহাই দিচ্ছে না। দিনরাত একটানা এভাবে নাজেহাল হওয়াটাকে যে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেব; তাও তো পারছি না। সেদিনটা বিমলার মায়ের সঙ্গেই রইলাম। রাতে হেঁশেলে বসেই মুখে কিছু দিলাম। মুখে খাওয়ার উঠছিল না, কেননা সব ক-টা মাছের পদেই গুঁড়ো শুঁটকি মাছ দেওয়া। মাছের কড়াই আর অন্যান্য পাত্র থেকেও শুঁটকি মাছের উৎকট কড়া গন্ধে চারপাশ ম ম করছিল। আমি কোনোদিন শুঁটকি মাছ খাইনি, সেজন্যে শরীরটা হঠাৎ খারাপ হতে শুরু করল। অনেক কষ্টে কোনোমতে খাওয়া সেরে বিমলার মায়ের পাশে শুয়ে পড়লাম। ঘুম এল না—আসবে কী করে? মাথায় যে একরাশ উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা।

পরের দিন সব ভোর-ভোর উঠে পড়ল, সঙ্গে আমিও। ফের পড়শি মেয়েরা একের পর এক উঁকি মারতে শুরু করল। ওরা যা বলাবলি করছিল, শুনে রাগে আমার গা চিড়বিড় করে জ্বলে উঠল। যে-ই আসছে, সে-ই জিগেস করছে: 'কই দেখি, স্বর্ণ কোন ঢলানি-ছেনাল মাগিকে নিয়ে এসেছে, দেখি।' বিমলার মা একটানা বলে যেতে থাকলেন: 'কেন? ও ঢলানি কেন হবে? ও একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে।' কিন্তু কেউ তাঁর কথা কানেই তুলছিল না। ওরা বলল: 'শুনেছি মেয়েটা নাকি মারকাটারি সুন্দরী! তাহলে ঢলানি হবে না তো কী! সে তুমি যতই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করো না কেন!' এই ধরনের কুৎসিত কথাবার্তা, যা কানে শোনাও পাপ, শুনে রাগে আমার রক্ত যেন ফুটতে লাগল। মনে হচ্ছিল, সেই-মুহূর্তে যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাই। কিন্তু যাবটা কোথায়? আর কত দুর্গতি যে আমার কপালে লেখা আছে!

বাড়ির লোকেরা যে যার মতো ঘর-গেরস্থালির কাজে লেগে পড়ল। বললাম, আমাকেও কিছু একটা কাজ দিতে। ঠাকমা আমাকে ডাকলেন, বললেন: 'এসো, আমরা মুড়ি ভাজি।' 'কিন্তু আমি তো মুড়ি ভাজতে জানি না।' তিনি বললেন: 'আরে, তাতে কী হয়েছে? শিখে নেবে এখন। আচ্ছা, এক কাজ করো তুমি, আমার জন্যে এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে এসো তো।' ও-দিককার বহু মহিলা হুঁকো টানতেন। আমি তাঁর জন্যে হুঁকো সাজিয়ে নিয়ে এলাম। কিন্তু সাজানো ঠিকমতো হল না। এমন ঠেসে তামাক ভরে দিয়েছিলাম যে টানলে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল না। ঠাকমা এক টান দিয়েই আমাকে বললেন: 'ফের সাজাও।' আমি তামাক টেনে বার করে ছিলিমে ঠাকমার কথামতো তামাক ভরে সাজিয়ে দিলাম। তিনি একটা দু-মুখ খোলা চুলো ধরালেন। খোলা দু-মুখের কারণ যাতে হাওয়া দিয়ে আগুন বাড়ানো যায়। চুলো ধরিয়ে তার ওপর একটা বড়োসড়ো বালিভরতি কড়াই চাপিয়ে দিলেন। অন্যদিকে আমাকে বসিয়ে একটি পাত্রে নুন-মেশানো ভেজা চাল নাড়িয়ে যেতে বললেন। আমি নাড়াতে লাগলাম। এরপর তিনি অন্য কী-একটা কাজে চলে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে কড়াইতে

. . . আচ্ছা, এক কাজ করো তুমি, আমার জন্যে এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে এসো তো।' ও-দিককার বহু মহিলা হুঁকো টানতেন। আমি তাঁর জন্যে হুঁকো সাজিয়ে নিয়ে এলাম। কিন্তু সাজানো ঠিকমতো হল না। . . .

একটা সরু কাঠি ঢুকিয়ে দিলেন। মুহূর্তে সেটা পুড়ে গেল। তিনি কড়াইটা চুলো থেকে নামিয়ে তার ভেতর পাত্রের চাল উপুড় করে ঢেলে দিলেন। তারপর ঘনঘন নাড়াতে লাগলেন। ফুটফাট করে খুব শব্দ হচ্ছিল। দেখতে না দেখতে এক কড়াই মুড়ি হয়ে গেল। কোনোদিন তো এসব দেখিনি, তাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি এরপর বালিসুদ্ধু মুড়ি একটা চালুনিতে ঢেলে দিলেন। বালি নীচে পড়ে গেল, ওপরে রইল মুড়ি। ফের তিনি কড়াইটা চুলোয় চাপিয়ে দিলেন। এইরকম করে মুড়ি ভাজা শিখে নিলাম আমিও। আমরা দু-জনে মিলে সেদিন খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক মুড়ি ভেজে ফেললাম।

মুড়ি ভাজা হয়ে গেলে ঠাকমা 'কুলুপি' নামে একটা চ্যাপটা-তলওয়ালা মাটির পাত্র চুলোর ওপর বসিয়ে দিলেন। আমাকে জিগেস করলেন: 'খই ভাজতে পারো?' আমি 'হ্যাঁ' বলাতে তিনি বসে বসে তদারকি করতে লাগলেন আর আমি খই ভাজতে লাগলাম। পরে বেশ কিছু ছোলাও ভেজেছিলাম। এইভাবে আমি নানা ঘর-গেরস্থালির কাজে

নিজেকে জড়িয়ে নিলাম। এরই মাঝে রজনীর (কালীর ভাই) বউ গোবর-ন্যাতা দিয়ে হেঁশেলের মেঝে লেপে দিচ্ছিল। তারপর এঁটো বাসনকোসন বের করে নিয়ে এল। ওদের দু-তিনটে ঝি ছিল। একজন উঠোনটা গোবর-ন্যাতা দিয়ে লেপে দিচ্ছিল। আর একজন চলে গেল ধান সেদ্ধ করতে—ধানটা আধসেদ্ধ হল। আর একটি ঝি চান করে চলে গেল জল আনতে। তারপর সে এসে বাটনা বাটা, চাল ধোয়া, কাটা-আনাজপাতি ধোয়া—এসব কাজে লেগে গেল। বিমলার মা পয়-পরিষ্কার করে বিধবা হেঁশেলের মেঝে মুছে নিয়ে চানে চলে গেলেন। এসে ওই হেঁশেলেই শুরু করলেন রান্না। রজনীর বউ আমিষ-হেঁশেলে রাঁধতে চলে গেলেন। তেসরা ঝি-টা বাসনকোসন মাজা-ধোয়া সেরে গোয়াল পরিষ্কার করতে লেগে গেল। গোরুদের জাবনা দেওয়ার ডাবাগুলো পরিষ্কার করে গোয়ালের জন্যে জল আনতে চলে গেল। ঠাকমার দুই ননদ আর তাঁর নিজের বোন আনাজ কুটতে বসে গেল। ঠাকমা সবার তদারকি করছেন। সবার জন্যে ঢালাও সকালের খাবার নারকেল-কোরা মেশানো মুড়ি-গুড়। চাকররা গোয়াল থেকে গোরু বার করছে। বারমহল, গোয়াল ঝেঁটিয়ে সাফ করছে, দুধ দুইছে, তামাক সাজছে, কাঠ কেটে ভেতরমহলে ডাঁই করে রাখছে। অন্য কেউ হেঁশেল-লাগোয়া সবজিবাগান থেকে সবজি তুলে আনছে, দুপুরে পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরছে কিংবা মাঠে গোরু চরাতে নিয়ে যাচ্ছে। সকলেই যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। কাউকে কিছু বলে দিতে হচ্ছে না—নিজের ভাগের কাজটা নিজেই করে নিচ্ছে। ঠাকমা এমন সুচারু বন্দোবস্ত করে রেখেছেন যে প্রতিটি কাজ এরকম নিখুঁতভাবে ঠিক সময়ে হয়ে যাচ্ছে। তিনি কাজের যে বিধি-ব্যবস্থা বেঁধে দিয়েছেন তা না-মানার সাহস

কয়েকদিন বাদে এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর গাঁয়ে এসে এঁদের বাড়িতেই উঠলেন। তলব করে পাঠালেন, আমাকে তাঁর সামনে আসতে। উৎকণ্ঠায়, ভয়ে আমার তো হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার জোগাড়।

কারোর নেই। বউ, মেয়ে, চাকর-বাকর, ঝি—কারও কাজে কোনো ভেদাভেদ নেই। সকলকেই সব ধরনের কাজ করতে হবে। কাজের সময় চিৎকার-চ্যাঁচামেচি, ঝগড়াঝাঁটি করা চলবে না; মুখ বুজে কাজ করে যেতে হবে। ঘর-গেরস্থালির কাজকর্ম গোছানোর এমন চমৎকার বন্দোবস্ত আর কোনো বাড়িতেই আমার চোখে পড়েনি।

ঠাকমা ছিলেন ওই বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী। তাঁর মতো তেজি আর ভালো মনের মানুষ আমি প্রায় দেখিইনি বললে চলে। সকলকেই তিনি সমান চোখে দেখতেন—সকলের প্রতিই তাঁর আচরণ ছিল সমান। একালের শিক্ষিতা নারীরা তাঁর নখের যুগ্যিও নয়। নিজের বাড়ির লোকের ভালোমন্দর দিকে তাঁর যেমন সজাগ নজর ছিল, তেমনি পড়শিদের ভালোমন্দ নিয়েও তাঁর ভাবনা কিছু কম ছিল না। পড়শিদের আপদে-বিপদে তিনি সবসময় তাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। এ আমি নিজের চোখে দেখেছি।

পরদিন স্বর্ণ তার বউকে নিয়ে আসতে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। রজনী এক মাস ধরে বাড়িতে নেই। তিনি গেছেন কোনো এক গাঁয়ে জমিদারির কাজকর্ম তদারকি করতে। বাড়িতে একমাত্র যে পুরুষমানুষটি আছেন, তিনি উন্মাদ। চিঠি পড়তে পারার মতো কেউ নেই। অথচ এর মধ্যে বেশ কিছু চিঠি এসেছে। তার মধ্যে তারাপ্রসন্নের কয়েকটা চিঠিও আছে—যার ভেতর আমার জন্যে অনেক খবরাখবর আর নানা জিজ্ঞাসাবাদ আছে। অন্য চিঠিগুলোর মধ্যে একটি রজনীর, আর একটি নলিনীর (কালীর বোন)—তাদের মা-কে লেখা। চিঠিতে লেখা আছে—বিমলার স্বামী বিমলাকে নিতে আসছে . . . এই সব চিঠি আমিই পড়ে শোনালাম।

তারাপ্রসন্ন চিঠিতে যা লিখেছিলেন তার সবটা আমি পড়ে শোনাইনি। তাঁর চিঠির মধ্যে ছিল: 'ওই মহিলাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া খুব ভুল হয়েছে। কেননা ও আমাকে চেনে। পুলিশ যদি একবার জানতে পারে তাহলে তো আমাকে গ্রেফতার করবেই। সেজন্যে তোমরা ওকে একটু চোখে চোখে রাখবে। দেখো, যেন হাতের বাইরে না চলে যায়। গাঁয়ে ওকে নিয়ে যত গুজগুজ-ফুসফুস হচ্ছে—হতে দাও। আর কখনো ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। মেয়েটি ধনীকন্যা আর অসাধারণ বুদ্ধিমতী। ওকে যেন তোমরা গায়ে-গতরে খাটার কাজ করতে বোলো না।' আমি চিঠির সবটাই পড়লাম, কেবল এইটুকু অংশ ছেড়ে গেলাম। চিঠিগুলো আমার জিম্মাতেই রইল। সবাই যে যার কাজে চলে গেলে আমি তারাপ্রসন্নের চিঠিটা লুকিয়ে ফেললাম; যাতে গোটা জীবনটা আমাকে এই বাড়িতে পড়ে না থাকতে হয়। কয়েকদিন বাদে এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর গাঁয়ে এসে এঁদের বাড়িতেই উঠলেন। তলব করে পাঠালেন, আমাকে তাঁর সামনে আসতে। উৎকণ্ঠায়, ভয়ে আমার তো হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার জোগাড়। কী করেছি আমি, যে তিনি আমায় তলব করলেন?

মাথায় ঘোমটা দিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি হাজির হলাম তাঁর সামনে। কপালে কী আছে, কে জানে! পড়শি ফুলচন্দ্র চক্রবর্তী সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে চলে যেতে বলা হল। সাব-ইন্সপেক্টর জিগেস করলেন: 'কোথা থেকে এসেছ?' জবাব দিলাম: 'বেনারস।' 'বেনারস থেকে এখানে এসেছ কেন?' তাঁকে জানালাম: 'আমার কেউ নেই, কে দেখভাল করবে? দুর্গামোহন দাশের কাছে এসেছিলাম—যদি কোথাও মাথা-গোঁজার একটা ঠাঁই পাওয়া যায়। তিনি আমাকে এখানে এসে এঁদের সঙ্গে কয়েকদিন থাকতে বললেন।' 'তুমি বনমালী চক্রবর্তীকে চেনো?', সাব-ইন্সপেক্টর বললেন, 'তিনি এঁদের কাকা।' বললাম: 'কিন্তু আমি তো তাঁকে চিনি না।' 'তুমি কি এঁদের বাড়িতে পাকাপাকিভাবে

থাকতে এসেছ নাকি?' বললাম: 'না।' 'কোথায় যাবে তুমি?' 'তা জানি না। ভগবান যেখানে টেনে নেবেন সেখানেই যাব।' 'যদি আমার মতো একজন কেউ তোমার বাকি জীবনটার দায়দায়িত্ব কাঁধে নিতে চায়, যাবে তাঁর সঙ্গে?' জবাব দিলাম: 'ঈশ্বরের পায়ে আমি আমার সমস্ত দায়ভার অর্পণ করেছি; কোনো মানুষের সাহায্যের খুব একটা দরকার দেখি না।' সাব-ইন্সপেক্টর বললেন: 'তুমি যদি বনমালীকে খুঁজে দিতে সাহায্য করো তবে চোদ্দো হাজার টাকা পুরস্কার পাবে।' বললাম: 'বনমালী কে—আমি তাই তো জানি না, পুরস্কারের কথা উঠছে কোথা থেকে?' তিনি বললেন: 'তুমি আমার সঙ্গে এলে, আমি তাকে ঠিক খুঁজে বার করব; আর তোমাকেও পুরস্কার পাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেব।' 'আপনার সঙ্গে কেন যাব আমি? আপনার মতো অনেক সাব-ইন্সপেক্টর আমার দেখা আছে।' 'কোথায় দেখেছ তাদের তুমি?' 'আমার দুই দেওর পুলিশ-ইন্সপেক্টর।' 'তাহলে তাদের সঙ্গে থাকো না কেন তুমি?' কারণ ওদের সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আমার মামলা-মোকদ্দমা চলছে।' সাব-ইন্সপেক্টর আর কিছু জিগেস করলেন না, বললেন: 'এবার তুমি যেতে পারো।'

'আপনার সঙ্গে কেন যাব আমি? আপনার মতো অনেক সাব-ইন্সপেক্টর আমার দেখা আছে।' 'কোথায় দেখেছ তাদের তুমি?' 'আমার দুই দেওর পুলিশ-ইন্সপেক্টর।' 'তাহলে তাদের সঙ্গে থাকো না কেন তুমি?' কারণ ওদের সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আমার মামলা-মোকদ্দমা চলছে।'

আমি উঠে ভেতরমহলে চলে গেলাম। ঢুকতে-না-ঢুকতেই সকলে মিলে আমায় ছেঁকে ধরল। সকলের মুখে এক রা: 'সাব-ইন্সপেক্টর কী বলল?' আমি তাদের সব কথা খুলে বললাম। কিন্তু কেউ আমার একটা কথাও বিশ্বাস করল না। তিনি যে আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমি শুধু সেটুকু বলিনি; মনে হয়েছিল, তাতে আমার মানমর্যাদা বলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। ওরা কেউই আমার কথায় বিশ্বাস করল না। আমাকে সন্দেহের নজরে দেখতে লাগল। ওদের সবসময়েই ভয়, আমি বোধ হয় ওদের পরিবারের গোপনকথা ফাঁস করে দেব। ওরা ভাবত, আমার চালচলনে একটা খল-কপট চাতুরি আছে। কিন্তু আমি ওদের সঙ্গে সাদাসাপটাই মেলামেশা করতাম। ওঁরা আমার বেশ যত্ন-আত্তি করতেন সত্যিই কিন্তু আমার ওপর সবসময় কড়া নজরও রাখতেন। ঠাকমা আমাকে তাঁর কাছেই নিয়ে শুতেন।

এর মধ্যে আর একতাড়া চিঠি পিয়োন দিয়ে গেল। আমি সেগুলো তাদের দিলাম আর পড়ে শোনালাম—কেবল তারাপ্রসন্ন দাদার চিঠিটা ছাড়া। পিয়োনকে বললাম: 'সব চিঠি এনে আমার হাতে দেবে। আমি তোমাকে মাসে মাসে বকশিশ দেব। আর আমি যে চিঠি দেব সেগুলো ডাকে দিয়ে দিও।' পিয়োন ভারি খুশি। সে রোজ আমার হাতে চিঠিগুলো দিত, আর আমার লেখা চিঠিগুলো ডাকে দিয়ে দিত। আমি মহেশচন্দ্র

. . . আমার এত ভালো লেগে গিয়েছিল যে গোটা জীবনটাই হয়তো ওদের সঙ্গে থেকে যেতে পারতাম; যদি না আমার জীবনে এত জটিলতা থাকত, . . .

ভট্টাচার্যকে আমার এখানকার বিপদ জানিয়ে চিঠি দিলাম। অনুরোধ করলাম, তিনি যেন যে করে পারেন আমায় উদ্ধার করেন। এ চিঠি না লিখে আমার উপায় ছিল না। তারাপ্রসন্ন দাদা পরের চিঠিটায় যা লিখেছিলেন, তাতে বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমি একটা বড়ো ঝামেলার সামনে পড়তে যাচ্ছি। চিঠিটার বয়ান নীচে তুলে দিচ্ছি:

> সকলের কুশল কামনা করে আমি এই চিঠি লিখছি। তোমার চিঠি পড়ে আমার উদ্‌বেগ শতগুণ বেড়ে গেছে। কারণ ওই মেয়েটি আমাকে খুব ভালোমতোই চেনে। আর ও পুলিশকে ঠিক কী বলেছে, তাও তোমরা জানতে পারনি। ফলে আমার সন্দেহ বেড়েই চলেছে। আমি অন্য কোথাও একটা চাকরি খুঁজছি, যাতে এখানকার চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারি। তোমাদের পই পই করে বলছি ওই মেয়েকে নজর-ছাড়া কোরো না। ওকে কোথাও যেতে দেওয়া যাবে না। একটা মেয়ের ভরণপোষণের থেকে আমার জীবনের দাম অনেক বেশি। তবে আমাদের পরিবারের কেউ একজন আতান্তরে পড়েছে বলে ওকে কি আমরা পায়ে ঠেলে দিতে পারি? কথাটা ভেবো, আর ওর দেখাশোনা কোরো। ওর অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই।

চিঠিটা পড়ে আমার তো মাথায় হাত। এখন কী করব? যে করেই হোক আমাকে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। সেজন্যেই মহেশবাবুকে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে উদ্ধারের জন্যে কিছুই করলেন না। চুপচাপ দিন কাটানো ছাড়া আমার তখন কীই-বা করার ছিল! পরে জানতে পেরেছিলাম, ওঁরা মহেশবাবুকে এখানে আসতে মানা করে দিয়েছেন।

স্বর্ণ তার বউকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। বউটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপিতিমে। শরীর দিয়ে লাবণ্য আর শুভলক্ষণ যেন ঝরে পড়ছে। সবসময়ই হাসিখুশি, সকলের সঙ্গে সমান চমৎকার আচার-আচরণ

আর মনটা যেন মায়ামমতায় ভরা। আমাকে যে কী ভালোবাসত, কী বলব—যেন আমি ওর নিজের বোন। ওর একটা কোলের মেয়ে ছিল—এমন একটা ফুটফুটে বাচ্চাকে ভালো-না-বেসে পারা যায়; আমি ওটাকে চটকে-মটকে খুব আদর করতাম। সত্যি বলছি, আমার এত ভালো লেগে গিয়েছিল যে গোটা জীবনটাই হয়তো ওদের সঙ্গে থেকে যেতে পারতাম; যদি না আমার জীবনে এত জটিলতা থাকত, যার জট ছাড়াতে আমার মনের মধ্যে সারাক্ষণই নানা টানা-পোড়েন চলত। মনের মধ্যে একটা ভাবনা চেপে বসেছিল—আমি ওদের হাতে বন্দি, ওরা কিছুতেই আমাকে এখান থেকে যেতে দেবে না। এছাড়া, গাঁয়ের সকলে বলাবলি করত: স্বর্ণ বাড়িতে একটা ছেনাল-ঢলানি মাগি ঢুকিয়েছে। এসব নোংরা কথা আমার গায়ে যেন সুঁচের মতো বিধত। পরিবারের সকলেই রেগেমেগে তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু এসব করে কি লোকের মুখ বন্ধ করা যায়? এজন্যেই আমি ভেতর ভেতর অশান্তিতে অস্থির হয়ে উঠতাম। যদিও ওঁরা আমাকে প্রাণ ঢেলে ভালোবাসতেন আর যত্ন-আত্তিও কিছু কম করতেন না। দিনরাত আমার একটাই ভাবনা: 'এখান থেকে পালাব কী করে?'

স্বর্ণর ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল। সে তার বউকে নিয়ে শহরের বাসায় চলে গেল। যতদূর মনে পড়ে সে-সময়েই ঠাকমা তার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে বেনারস গিয়েছিলেন, সঙ্গে রজনী। আমিও যেতে

গভীর রাতে আমি একটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনতে পেলাম—কেউ যেন দরমার বেড়াটা কাটছে। আমি প্রায় শ্বাস বন্ধ করে রইলাম। বুকের ভেতরটা এমন ধকধক করছিল, মনে হচ্ছিল যে কেউ শুনে ফেলবে।

চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে নিলেন না। মহেশবাবুকে চিঠি লিখলাম। তিনি জবাব দিলেন: 'দুর্গামোহন দাশ না-ফেরা পর্যন্ত তুমি ওখানেই থাকো। স্বর্ণ তোমাকে এখন আসতে দেবে না। আমার নিজেরও তো কোনো সংসার নেই। তোমাকে নিয়ে গিয়ে রাখব কোথায়?'

মাস খানেক বাদে ঠাকমা ফিরে এলেন। এরমধ্যে রজনীর বউয়ের একটা বাচ্চা হয়েছে। এক মাস বাদে আঁতুড়-টাঁতুড় সব মিটে গেলে, যা যা রীত-প্রকরণ আছে সব মানার পর তাকে বিমলার স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। স্বর্ণর মা আর তাঁর দুই খুড়ি-শাশুড়ি বাড়িতে রয়ে গেলেন।

এরপর ঠাকমা আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন মুনশিগঞ্জ। বুঝতে পারিনি, কেন তিনি আমাকে সঙ্গে নিলেন। যেতে বলেছিলেন তাই গিয়েছিলাম। ওখানে খুব বেশি লোকজন নেই—কালীচরণ নামে একটা চাকর, স্বর্ণ, ওর বউ আর ওদের বাচ্চাটা, ঠাকমা আর আমি। অফিসের আরদালি কালী শিকদার তাঁর পরিবার নিয়ে বাড়ির অন্য দিকটায় থাকতেন। আর একজন কেরানি, তাঁর নামও রজনী, আমার সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। কালীচরণ মানুষটি খুবই ভালোমানুষ। বউটি যখন রান্না করত আমি তখন ওর মেয়েকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম।

আমি একটা গামছাকে দড়ির মতো করে চোরের গলায় জড়িয়ে যত জোরে পারি পেঁচিয়ে ধরলাম। চোরটা প্রাণপণে ছাড়াতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমার গায়ে তখন যেন অসুরের শক্তি ভর করেছে।

বাড়ির আর সব কাজ কালীচরণ করত একা হাতে—দোকান-বাজার করা, জল তোলা, জল টানা, বাটনা বাটা এইরকম সব কাজ। ঠাকমার জন্যে স্বর্ণবাবু নিজে গিয়ে জল নিয়ে আসতেন। ঠাকমা ভোর হতেই ঘাটে চলে যেতেন চান করতে। আমি বাড়িতেই চান করতাম।

স্বর্ণ অফিসে মুনসিগঞ্জের রেজিস্ট্রারের পদে কাজ করত। মাইনে ছিল খুবই কম। কিন্তু দু-তিনশো টাকা 'উপরি আয়' হত। একদিন শুনতে পেলাম, স্বর্ণ সেদিনই ঢাকায় যাচ্ছে। সে সকালের জলখাবার খেয়েই ঢাকা চলে গেল। আমরা নিয়মমাফিক যে যার মতো কাজ করতে লাগলাম। যেহেতু সে-রাতে ও ফিরবে না, সেজন্যে ঠাকমা সেদিন স্বর্ণর বউয়ের সঙ্গে ওর ঘরেই শুলেন। এমনিতে আমি আর ঠাকমাই এক ঘরে শুতাম। কিন্তু সে-রাতে ওই ঘরে আমি একা। আমি যে ঘরে শুতাম সেটার খোড়ো চাল আর দরমার বেড়া। আমার নিজের বলতে তো কিছুই ছিল না। কিন্তু ঠাকমার বড়ো তোরঙ্গটা পাহারা দিতে হত।

গভীর রাতে আমি একটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনতে পেলাম—কেউ যেন দরমার বেড়াটা কাটছে। আমি প্রায় শ্বাস বন্ধ করে রইলাম। বুকের ভেতরটা এমন ধকধক করছিল, মনে হচ্ছিল যে কেউ শুনে ফেলবে। ফের ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শোনা গেল। এবার দেখলাম, দরমাটা কেটে ফেলা হয়েছে। খানিক পরে চোর দরমার ওই কাটা জায়গাটা দিয়ে তার মাথা গলিয়ে দিল, ধীরে ধীরে কোমর পর্যন্ত ঢুকিয়ে নিল। আমি একটা গামছাকে দড়ির মতো করে চোরের গলায় জড়িয়ে যত জোরে পারি পেঁচিয়ে ধরলাম। চোরটা প্রাণপণে ছাড়াতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমার গায়ে তখন যেন অসুরের শক্তি ভর করেছে। চোরটা শত চেষ্টাতেও আমার হাত থেকে ছাড়া পায়নি। আমি একটা বিকট শব্দে চিৎকার করে উঠলাম: 'ঠাকমা!' চোরটা তখন গোঙাচ্ছিল। (চলবে) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক একজন প্রাবন্ধিক ও অভিধানকার।

কেয়ার গিভার-শুশ্রূষাকারী

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত

দৃশ্য এক: আপনার প্রিয় সন্তানের অসুখ। ধরে নিন জ্বর। ডাক্তার দেখালেন। তিনি ওষুধ লিখে দিলেন আর বলে দিলেন সাত দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়াতে হবে। জ্বর মাপতে হবে। বেশি বেড়ে গেলে গা হাত পা মুছিয়ে দিতে হবে। মাথায় জল ঢালতে হবে। আপনারা স্বামী স্ত্রী দু-জনেই চাকরি করেন। ডাক্তার-এর নিদানপত্র মানতে হলে ওই মুহূর্ত থেকে আপনাদের দু-জনের একজনকে অথবা পালা করে দু-জনকেই নতুন ভূমিকায় নামতে হবে। ভূমিকাটির ইংরেজি নাম কেয়ার-গিভার। বাংলায় নাম দিলাম সেবক/সেবিকা।

দৃশ্য দুই: প্রচণ্ড মাথায় ব্যথা নিয়ে আপনার স্ত্রী জরুরি বিভাগে। সেখানে জানা গেল স্ট্রোক। ট্রলিতে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হল আইটিইউ-তে। আপনি ঢুকতে গেলে আপনাকে আটকে দেওয়া হল। লক্ষণ রেখা। আপনি রুগীর বাড়ির লোক। ওর বেশি যেতে পারবেন না। দেওয়ালে লাগানো কাচের এপার থেকেই দেখতে পেলেন যে ডাক্তার, সিস্টার টেকনিশিয়ান সবাই মিলে যুদ্ধ শুরু করেছে। আপনি নির্বাক দর্শক। ক-দিন পরে হয়তো স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। ওনার একটা দিক পড়ে গেছে। পক্ষাঘাত। কে হবে কেয়ার-গিভার ?

দৃশ্য তিন: অফিস ছুটি নিয়ে প্রথম দফা কেমোথেরাপির পর আপনার ক্যান্সার রোগগ্রস্ত বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন আর ভাবছেন যে কাল ছুটিটা কীভাবে ম্যানেজ করবেন। কাল কেমো-র লাস্ট ডেট। যে মানুষটা আর ছয় মাস বাঁচবে তাঁকে কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায় সে ভাষা আপনার জানা নেই।

গ্রাম থেকে কলকাতার বড়ো হাসপাতালে এসে অনুসন্ধান মানে মে আই হেলপ ইউ কাউন্টার-এর সন্ধান পেতে যে মানুষটা ঠোক্কর খাচ্ছেন, অসুস্থ প্রিয়জনকে বসিয়ে রেখে যে মানুষটি টিকিট কাউন্টারে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছেন, লালবাতি জ্বালানো অপারেশন থিয়েটারের সামনে যে মানুষটি বসার সিট ছেড়ে অধৈর্য হয়ে পদচারণা করছেন, ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যে মানুষটি বেডের রেলিং আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বা এক বোতল রক্তের জন্য হন্যে হয়ে ছোটাছুটি করছেন—এঁদের একটাই পরিচয়, এঁরা রুগীর বাড়ির লোক, বাংলায় যাকে বলে পেশেন্ট পার্টি। এঁদের মধ্যেই আছেন আমাদের কেয়ার-গিভার সেবক/সেবিকা।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা আসুন একটু সময় খরচ করি ওই ভূমিকাটাকে, ওই লোকটিকে জানতে, বুঝতে। আমি, আপনি আমরা কেউ কিন্তু অভ্যস্ত নই ওই ভূমিকাটায় নামতে। কেয়ার-গিভার-এর রোল। নিষ্ঠুর জীবন কিন্তু যেকোনো দিন বাধ্য করতে পারে আমাকে আপনাকে ওই সেবক/সেবিকার ভূমিকায় নামতে। হয়তো করেও ফেলেছে এর মধ্যে।

স্বাস্থ্যের গতানুগতিক বৃত্তের বাইরে, রুগী ও চিকিৎসক/চিকিৎসা কর্মীদের নিয়ে প্রচলিত ডিসকোর্স-এ কিছুটা ব্রাত্য, অবহেলিত, উপেক্ষিত এই মানুষটির প্রতি বোধ হয় আমাদের এবার মনোযোগ দেওয়ার সময় এসেছে।

সবাই বোধ হয় একমত হব যে সেই লোকটির আর্থিক, সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক জগতে ছোটো থেকে বড়ো ধাক্কা ও তার ফলে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই ধাক্কাটিকে চাহিদা বা নিড হিসেবে বর্ণনা করতে পারি।

কীভাবে সামাল দেবে এই পরিবর্তনের ধাক্কা সেটা নির্ভর করে সেই মানুষটির নাগালের মধ্যে কতটা পরিমাণ সম্পদ বা রিসোর্স-এর জোগান আছে এবং রুগীর রোগটি কী ধরনের, তাঁর পরিচর্যার চাহিদাই বা কেমন।

পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী তাঁকে কতটা সাহায্য করতে পারবেন লোকবল দিয়ে, অর্থ দিয়ে, সময় দিয়ে ইত্যাদিও তাঁর সম্পদের জোগান হিসেবে ধরতে হবে।

রোগটির যে যে বৈশিষ্ট্য এই "চাহিদা" বিষয়টিকে প্রভাবিত করবে তার প্রথম উপাদানই হল রোগটির মেয়াদ। যত দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা প্রয়োজন তত তার চাহিদা। চিকিৎসা পদ্ধতি যত ব্যয়সাধ্য তার চাহিদা তত বেশি। যে রোগ যত বেশি বেদনাদায়ক তার চাহিদা তত বেশি।

এটা সহজবোধ্য যে ওই সেবক বা সেবিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ মানুষটির ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক জীবন যে ছন্দে চলছিল তারও তাল কেটে যেতে বাধ্য। ওপরে বর্ণিত জোগান আর চাহিদার মধ্যে অসামঞ্জস্য যত বেশি থাকবে এই তাল কেটে যাওয়াটা তত বেশি পরিমাণে হবে।

সেই মানুষটি যদি পরিবারের অন্যতম বা প্রধান রোজগেরে হন, তাহলে কাজ থেকে ছুটি নিলে তাঁর সংসারই বা চলবে কী করে আর চিকিৎসার খরচ জোগাবেন কী করে? ক-দিন ছুটি নেওয়া যাবে কাজ থেকে?

রুগীকে যদি দীর্ঘদিন বাড়িতে বা হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করতে হয় তাহলে ওই সেবক/সেবিকাকে তাঁর সামাজিক জীবনের অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে, ছাড়তে হবে কিছু সাধ, মজা, বিনোদন। মূল্যবান সময়-এর বেশির ভাগই চলে যাবে সেবার কাজে।

আর্থিক বা সামাজিক জীবনের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় ব্যক্তিগত জীবনে।

নিরবচ্ছিন্ন সম্পদ জোগানোর দুশ্চিন্তা, সামাজিক-পারিবারিক জীবন থেকে কিছুটা হলেও বিচ্ছিন্নতা, এই সবের পাশাপাশি মূল বিষয়টি অর্থাৎ রুগী আদৌ সুস্থ হবেন কিনা, হলে কতটা সুস্থ স্বাভাবিক হবেন, কত দিনে হবেন ইত্যাদি নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয় সংশয়। আদৌ রোগটা ঠিক মতো ধরা পড়ল কিনা, সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালো চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা গেল কিনা ইত্যাদি।

রোগ যদি আদৌ না সারার হয়, তাহলে এর সঙ্গে যুক্ত হবে প্রভূত হতাশা ও বিষণ্ণতা। সব মিলিয়ে প্রচণ্ড এক মানসিক চাপ। এই চাপ সহ্য করার মতো ক্ষমতাটাও তাই একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সেবক বা সেবিকার ভূমিকায় অনভ্যস্ত মানুষের ওপর শারীরিক চাপটাও কম নয়। এটা নির্ভর করে ওই সেবক/সেবিকার নিজের বয়েস কত, শারীরিক অবস্থা কেমন, অতীত কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা, রুগীর সাথে তাঁর সম্পর্ক কেমন, সেবার পাশাপাশি সংসারে বা পরিবারে তাঁকে আর কী কী ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে ইত্যাদি।

সংসার বা পরিবারকে একটি একক বা ইউনিট হিসেবে ধরে নিয়ে আলোচনা করলে যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি বাদ চলে যাবে সেটি হল সামগ্রিক পারিপার্শ্বিক সমসাময়িক সমাজে ওই এককটির অবস্থান। রোগ, রুগী তার চিকিৎসা পরিষেবা এবং সেবা—কোনোটাই কিন্তু দেশ কাল সমাজের প্রেক্ষিতের বাইরে নয়।

একজন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত মানুষকে বাড়িতে রেখে সেবার গতি-প্রকৃতি অনেকটাই আলাদা হয়ে যায় যদি রোগটার নাম এইডস হয়। বিদেশে প্রচলন আছে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্তদের পরিবার-পরিজন মিলে সহায়ক-গোষ্ঠী বা সাপোর্ট গ্রুপ গড়ে তোলার। আমাদের দেশে ওই ধরনের গোষ্ঠী গড়ে তোলার সংস্কৃতি নেহাতই শৈশব অবস্থায় আছে।

সেবক/সেবিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ যে বিভ্রান্ত, হতাশ, ক্লান্ত মানুষটিকে নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম—সমাজের কাছে, সরকারের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে, সভ্যতার কাছে, মানবতার কাছে তাঁর কিছু দাবি আছে। সমাজ, সরকার, রাষ্ট্র কীভাবে এই মানুষটির পাশে দাঁড়াবে সে আলোচনা আর এক দিন পরবর্তী কোনো পর্বে হবে। আজ ব্যক্তিমানুষের ভূমিকা বুঝে নেওয়ার দিন।

এই মানুষটি সাহচর্য চান, সহমর্মিতা চান। আর তার চেয়েও বেশি করে চান সঠিক পরামর্শ, উৎসাহ আর প্রচুর প্রচুর জিজ্ঞাসার উত্তর। আন্তরিক ইচ্ছে থাকলেও যেকোনো সহ-নাগরিক হিসেবে আপনি এইসব কিছু তাঁকে দিতে পারবেন না। কিন্তু একজন চিকিৎসক চাইলে তাঁকে অনেক কিছু দিতে পারবেন।

এর জন্য সবার আগে চিকিৎসক আর রুগীর বাড়ির লোকের মধ্যে টানা ওই লক্ষণ রেখাটাকে মুছে ফেলতে হবে। ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান, কাউন্সিলর, অচিকিৎসক কর্মচারী—এদের নিয়ে তৈরি চিকিৎসা-টিমের মধ্যে রুগীর ওই বাড়ির লোকটিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে টিমের অন্যতম সদস্য হিসেবে।

রুগীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তৈরি করার দিন থেকে ওই সেবক/সেবিকা থাকবেন টিমের মধ্যে। তাঁর সমস্ত সম্ভাব্য প্রশ্নের যথাসাধ্য অকপট উত্তর দিয়ে মনের সংশয় দূর করতে হবে। সঠিক বৈজ্ঞানিক পরামর্শ আর উৎসাহদানের মাধ্যমে তাঁকে এক সুদক্ষ সেবক/সেবিকায় পরিণত করতে হবে। ওই টিমের নেতা বা টিম লিডার হিসেবে চিকিৎসককেই সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নিতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

প্রিয় অসুস্থ মানুষটার হাত ধরে যিনি বসে আছেন রোগশয্যার পাশে, ডাক্তার হিসেবে তাঁর কাছেও একবার অন্তত জানতে চাইতে হবে সেই মানুষটি কেমন আছেন? তিনি রুগীকে নিয়ম করে চার বেলা ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে নিজের প্রেশারের ওষুধটা খেতে ভুলে যাননি তো? তিনিও মানুষ। তাঁর শরীরটাও শরীর।

আজ মৃত্যুর গ্রাস থেকে জীবনকে ছিনিয়ে আনার খেলায় মাঠে নেমেছে আমাদের টিম। টিমের সবাইকে আমি চিনি না। এটুকু জানি যে

প্রিয় অসুস্থ মানুষটার হাত ধরে যিনি বসে আছেন রোগশয্যার পাশে, ডাক্তার হিসেবে তাঁর কাছেও একবার অন্তত জানতে চাইতে হবে সেই মানুষটি কেমন আছেন?

টিমের ক্যাপ্টেন কাম কোচ আমারই কোনো সতীর্থ চিকিৎসক। আমার ভরসা আছে তার ওপরে। খেলাটা সহজ নয়। এই মরণ-বাঁচন খেলায় জিত তো জিত। হার মানে মৃত্যু। এ খেলায় কোনো সম্মানজনক ড্র বা অমীমাংসিত ফল বলে কিছু নেই। গোটা টিমটাকেই মাঠে নেমে লাগাতার দুর্দান্ত খেলতে হবে।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, আপনিও আমাদের টিমের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। সাইড লাইনের ধারে গ্যালারিতে বসে হাততালি আর গালি দেওয়ার দিন শেষ। আসুন সবাই মিলেই মাঠে নামি একই টিমের হয়ে।

জিততে আমাদের হবেই। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, ডিপিএইচ, স্বাস্থ্য প্রশাসক।

সন্তান সান্নিধ্যে সুস্থতার আশায় জীবন্মৃতকে চিকিৎসা সহায়তা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছেন ডাক্তার

ছয় মাস ধরে হাসপাতালে ভর্তি এক জীবন্মৃত মহিলা, তাঁর পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে বাড়ি পাঠানো হল তাঁকে। এ কি হসপিস কেয়ার, নাকি হাসপাতালের বেড খালি করার প্রয়াস? লিখেছেন **পিয়ালী দে বিশ্বাস**। সঙ্গে হসপিস সম্বন্ধে সম্পাদকীয় সংযোজন করা হয়েছে।

রাইলস টিউবের সাহায্যে খাওয়া, বেঁচে থাকতে হলে একটি মানুষের সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যে যে কাজ করতে হয়, সে সব কাজই অন্য কাউকে দিয়েই সারতে হয় তাঁকে। কারও কথারই উত্তর দেন না, চিনতে পারেন না স্বামীসহ অন্যান্য আত্মীয়দের। হাসপাতালের বেডে শুয়ে মাঝে মাঝে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া প্রায় সবই ভুলে গেছেন তিনি। ভুলেছেন স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নেওয়াটাও। গলায় শ্বাসনালিতে ফুটো করে ট্রেকিয়োস্টোমি নল পরিয়ে রাখা হয়েছে, যার সাহায্যে নিশ্বাস নিয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছেন বছর তিরিশের গৃহবধূ গীতিকা দাশ, প্রায় ৬ মাস ধরে ভর্তি ছিলেন এসএসকেএম-এর আইটিইউ-তে। তাঁর ছ-মাসের বাচ্চাকে এখনও দেখেননি গীতিকা দেবী। বাড়িতে ১৩ বছর ও ৬ বছর বয়সের আরও দুই মেয়ে আছে। হয়তো ওই সন্তানদের চোখ তুলে দেখবেনও না কোনোদিন। কিন্তু মা আর সন্তানের রসায়ন নাকি জগতের সব নিয়মের থেকে আলাদা। সেই রসায়নকে কাজে লাগিয়েই মিরাক্যালের অপেক্ষায় আছেন ডাক্তাররা। বাড়ি গেলে দ্রুত সুস্থ হতে পারেন, এই আশা নিয়েই রাইলস টিউব আর অক্সিজেনের নল দিয়ে তাঁরা পুজোর আগে চতুর্থীর দিন বাড়ি পাঠিয়েছেন গীতিকাকে। তাঁদের আশা, সন্তানদের ভালোবাসার স্পর্শে যদি নতুন করে বেঁচে ওঠেন গীতিকা।

এসএসকেএম হাসপাতালের আইটিইউ-র প্রধান রজত চৌধুরি জানিয়েছেন, ‘একজন মানুষ সবচেয়ে ভালো থাকেন তাঁর বাড়ির পরিচিত পরিবেশেই। চেনা মুখ, চেনা পরিবেশ এই ধরনের রোগীদের সুস্থ হতে সাহায্য করে তা প্রমাণিত সত্য। আমরা আশা করছি, নিজের সন্তান ও নিকটাত্মীয়দের স্পর্শ ও ভালোবাসায় গীতিকা আরও সুস্থ হয়ে উঠবেন। বিদেশে রোগীকে বাড়ির পরিবেশ দিতে হাসপাতালের মধ্যেই রোগীর প্রিয়জনদের থাকার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও বেসরকারি ক্ষেত্রে কয়েকটি জায়গায় “হসপিস”-এর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোনো সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে এখনও এই ধরনের পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। আমরা পরীক্ষামূলকভাবে ৬ মাস গীতিকাকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা চালানোর পরামর্শ দিয়েছি, তারপরে কোনো সমস্যা হলে আমরা তো আছিই। ফোনের মাধ্যমে সবসময় পরিবারের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে আমাদের।’

- ভারতের প্রথম হসপিস—শান্তি অবেদনা সদন মুম্বাইয়ে ১৯৮৬-তে, পরের ৫ বছরের তার দু-টি শাখা দিল্লি ও গোয়ায়।
- গৌহাটি পেন অ্যান্ড প্যালিয়াটিভ কেয়ার সোসাইটি আসামে।
- জীবোদয়া হসপিস চেন্নাইয়ে।
- ক্যানসাপোর্ট দিল্লিতে।
- লক্ষ্মী প্যালিয়েটিভ কেয়ার ট্রাস্ট চেন্নাইয়ে।
- করুণাশ্রয় হসপিস চেন্নাইয়ে।

কথা রেখেছেন ওই চিকিৎসক, প্রয়োজনে ফোন করলেই তাঁর পরামর্শ পেয়েছেন বাড়ির লোকেরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও গীতিকার পিঠে প্রায় দেড় ইঞ্চি গভীর বেডসোর হয়েছে। তা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য প্রতিদিন ড্রেসিং করাতে হচ্ছে। ড্রেসিং-এর জন্য প্রতিদিন ৫০০ টাকা খরচ করার মতো আর্থিক অবস্থা নেই গীতিকার পরিবারের। স্বামী মিন্টু দাশ-এর কথায়, ‘শুধু ওই খরচই নয়, প্রতিদিনের ওষুধ পথ্য ও আনুষঙ্গিক কোনো খরচ চালানোর মতো পরিস্থিতি নেই আমাদের পরিবারের।’ মিন্টুবাবু ট্রলারে করে মাছ ধরতে যান। মাসিক আয় ৬ থেকে ৭ হাজারের মতো। ‘যা দিয়ে কোনোমতে সংসার চালানো গেলেও আমাদের দেশে চিকিৎসা চালানো সম্ভব নয়। অবস্থা এমন যে এখন গীতিকার চিকিৎসার জন্য পাড়া থেকে চাঁদা তুলতে হচ্ছে। জানিনা সে সাহায্যও আর ক-দিন পাব?’

গত এপ্রিলে সিজারিয়ান সেকশন প্রসবের ১ ঘণ্টার মধ্যে মস্তিষ্কে

অক্সিজেনের অভাবে হাই-পোক্সিক ইস্কিমিক এনকেফালোপ্যাথিতে আক্রান্ত হন তিনি। খিঁচুনি হতে থাকে তাঁর। এসএসকেএম-এ চিকিৎসকরা তাঁকে দেখেই আইটিইউ-তে ভর্তি করে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করেন। আইটিইউ-এর চিকিৎসক ও নার্সদের নিরলস চেষ্টাতেই ওই পরিস্থিতি থেকে কিছুটা সুস্থ হয়েছেন গীতিকা। এখন নিজে নিজে না খেতে পারলেও প্রেসার স্বাভাবিক রয়েছে এবং ভেন্টিলেশনও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকেরা তাঁর বাড়ির লোকেদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়েছেন কীভাবে রাইলস টিউবে খাবার খাওয়াতে হয় বা সাকশান মেশিনের সাহায্যে শ্লেষ্মা বের করতে হয়। ডা. রজত চৌধুরি জানিয়েছেন, যেহেতু গীতিকা দেবীর মস্তিষ্কের টিসু স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবে নাক দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছেন। এমন অনেক কিছুই ভুলে গিয়েছেন তিনি। ফলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে কীভাবে তাঁকে শুশ্রূষা করবেন, সে বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন তাঁর পরিবারও। এসএসকেএম-এ থাকার সময়েই রোগীর চিকিৎসা চালাতে দিনপিছু হাজার টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছিল, প্রতিদিনের সেই খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল গীতিকা দেবীর পরিবারের

‘জমি কেনার জন্য কিছু টাকা জমিয়েছিলাম। স্ত্রী-র চিকিৎসার পেছনে সেই টাকা সব শেষ। বহু কষ্ট করে এই ১৫ হাজার জোগাড় করেছি। ডাক্তারবাবুরা বাড়ি নিয়ে যেতে বলার জন্যই আমরা ওঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছি।

কাছে। তার উপর আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা একটি পরিবারের পক্ষে রাইলস টিউব, সাকশান মেশিন, নেবুলাইজার, সাকশান ক্যাথিটার, বিশেষ সুবিধাযুক্ত বিছানাসহ অন্যান্য বিকল্প ব্যবস্থার আয়োজন করা সত্যিই সমস্যার ছিল। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে গীতিকাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাখার পরিকাঠামো তৈরি করতে সবমিলিয়ে প্রায় ১৫ হাজার টাকার সামগ্রী কিনতে হয়েছে তাঁদের। তাঁর স্বামী মিন্টু দাশ-এর আক্ষেপ, ‘জমি কেনার জন্য কিছু টাকা জমিয়েছিলাম। স্ত্রী-র চিকিৎসার পেছনে সেই টাকা সব শেষ। বহু কষ্ট করে এই ১৫ হাজার জোগাড় করেছি। ডাক্তারবাবুরা বাড়ি নিয়ে যেতে বলার জন্যই আমরা ওঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছি। কিন্তু বাড়িতে বিদ্যুৎ সবসময় থাকে না। সাকশান মেশিনসহ অন্যান্য মেশিন চালানো আমাদের পক্ষে সমস্যার। কিন্তু ওঁকে বাঁচাতে তো হবে।’ গীতিকার পরিবারের এক আত্মীয়ার দাবি বাড়ি আনার পর মেয়েদের ডাকে চোখ মেলে তাকায় গীতিকা। অন্য কোনো অভিব্যক্তি না প্রকাশ করলেও চোখের সাহায্যে কিছু বলতে চায়।

কিন্তু এইভাবে মুমূর্ষু রোগীকে পরিবারের সান্নিধ্যে পাঠানোর জন্য হাসপাতালের আইটিইউ থেকে বের করা কতটা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সন্তান বা বাড়ির লোকেদের সংস্পর্শে এই ধরনের রোগীর কতটা উন্নতি হবে তা জানা নেই, এসএসকেএম হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাকেন্দ্রে নতুন রোগীদের বেডের সুযোগ দেওয়ার জন্যই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চিত্র ১. চেন্নাইয়ের জীবোদয়া হসপিসের একটি চিত্র

সম্পাদকীয় সংযোজন: যে ধরনের যত্নের চেষ্টা করা হচ্ছে গীতিকা দেবীর জন্য, তা বিদেশে বহুল প্রচলিত, তাকে বলা হয় হসপিস যত্ন (hospice care)।

হসপিস কোনো নির্দিষ্ট স্থান নয়, হসপিস যত্নের এক দর্শন, যত্নের এক পরিকাঠামো। এই যত্ন দেওয়া যেতে পারে রোগীর বাড়িতে, হাসপাতালে, নার্সিং হোমে বা জীবনের অন্তিম পর্যায়ের রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানে।

হসপিস আসলে বলা হত ক্লান্ত পথযাত্রীদের জন্য নির্মিত আশ্রয়স্থলকে। একাদশ শতাব্দীতে, ১০৬৫ খিস্টাব্দ নাগাদ ক্রুসেডাররা সেরে উঠবেন না এমন রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রথম যত্নের ব্যবস্থা করেন। তারপর চতুর্দশ শতাব্দীতে রোডসে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের যত্নের সূচনা হয়। ১৯০২-০৫ সময়কালে অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, জাপান, চীন ও রাশিয়ায় হসপিস যত্ন বিস্তার লাভ করে। আধুনিক হসপিস যত্নের ধারণার জন্ম দেন সিসিলি সন্ডার্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ষাটের দশকে।

হসপিস সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো এই রকম:

☞ কেবল ক্যান্সার রোগীদের বা মরণাপন্ন মানুষদের জন্য।

☞ যখন পরিবারের লোকেরা যত্ন নিতে সক্ষম, তখনই কেবল কাজে লাগে।

☞ যাঁদের উঁচু স্তরের যত্নের প্রয়োজন নেই, তাঁদের জন্যই কেবল হসপিস।

☞ যাঁরা মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত কেবল তাঁদের জন্যই এই পরিষেবা।

☞ এতে খরচ বেশি।

☞ যখন কোনো আশা নেই তখনই কেবল হসপিস।

কিন্তু বাস্তব হল: ৮০% হসপিস পরিষেবা বাড়িতে দেওয়া হয়। দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলোর অন্তিম স্তরের রোগীদের এখন বেশি বেশি করে হসপিস যত্ন দেওয়া হচ্ছে। সব বয়সের মানুষকেই হসপিস পরিষেবা দেওয়া যায়। হসপিস দুঃখকাতর রোগীর পরিবারকেও মরণাপন্ন রোগীর মতোই গুরুত্ব দেয়, অনেক সময়ই বিকল্প স্থান বা বিকল্প পরিষেবা সম্ভবপর হলেও হসপিস যত্ন দেওয়া যায়। হসপিস বেদনা কমানোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, হসপিস মানুষকে নিজস্ব গতিতে নিজের রাস্তা খুঁজে বার করতে সাহায্য করে। অনেক সময়ই হসপিস জীবনের অন্তিম সময়ের অন্যান্য চিকিৎসার চেয়ে কম খরচের।

রোগীর পরিবারের সদস্যদের হসপিস কাউন্সেলিং করে, রেস্পাইট কেয়ার দেয়, স্বাস্থ্যশিক্ষা দেয়, . . . দাহ বা কবর দেওয়ায় সাহায্য করে, মৃত্যুর পর দুঃখ ভোলাতে সাহায্য করে।

হসপিস যত্নের স্তর বিভাগ এই রকম—১. ঘরে রেখে রুটিন যত্ন, ২. ঘরে রেখে লাগাতার যত্ন, ৩. হাসপাতালে ভর্তি রেখে সাধারণ যত্ন, ৪. রেস্পাইট যত্ন অর্থাৎ কম সময়ের জন্য রোগীর পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে অন্য ব্যবস্থা করা।

হসপিসের টিমে থাকেন—১. প্রাথমিক চিকিৎসক, ২. হসপিস চিকিৎসক, ৩. নার্স, ৪. গৃহ স্বাস্থ্য সহায়ক, ৫. ধর্মগুরু, ৬. স্বেচ্ছাসেবী।

হসপিস রোগীর যত্ন নেয়, ব্যথা ও রোগের অন্যান্য উপসর্গগুলোর চিকিৎসা করে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজন মেটায়, কাউন্সেলিং করে, অপূর্ণ আইনি বা আর্থিক বিলিবন্দোবস্ত করতে এবং মৃত্যুর পর দাহ/কবরের ব্যবস্থা করায় রোগীকে সাহায্য করে, ধর্মীয় প্রয়োজন মেটায়।

রোগীর পরিবারের সদস্যদের হসপিস কাউন্সেলিং করে, রেস্পাইট কেয়ার দেয়, স্বাস্থ্যশিক্ষা দেয়, বাস্তবিক সাহায্য করে, দাহ বা কবর দেওয়ায় সাহায্য করে, মৃত্যুর পর দুঃখ ভোলাতে সাহায্য করে।

আমাদের দেশে সমস্ত মানুষের জন্য হসপিসের মতো পরিষেবা কবে পাওয়া যাবে?! স্বাস্থ্যের বৃত্তে

পিয়ালী দে বিশ্বাস, এক বাংলা দৈনিকের সাংবাদিক।

Advt.

এখনই ভালোবাসা যায়

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা

ইন্সটিটিউট অব চাইল্ড হেলথ। পেডিয়াট্রিক্সে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করতে ঢুকেছি। ফার্স্ট-ইয়ার পিজিটি-দের বাস্তবিক অর্থে নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকে না। টানা ৬ ঘণ্টার ঘুম মানে বিরাট বিনোদন! আমার নিজের ৯ কিলো ওজন কমে ছিল এক বছরে।

যাই হোক, কাজের কথায় আসি।

৮ বছরের একটা বাচ্চা ভর্তি হয়। নিউমোনিয়া। প্রবল জ্বর, শ্বাসকষ্ট। তার আগে অবশ্য সাইড-এফেক্টবিহীন হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা চলেছিল বেশ কয়েকদিন। শেষমেষ কাজ না হতে এসে পড়ে বিষাক্ত ওষুধ প্রেসক্রাইব করা শয়তান ডাক্তারদের হাতে। অতঃপর ২ সপ্তাহের লড়াই।

হ্যাঁ, আজ আর হারার গল্প নয়। এই গল্পটা জয়ের।

উপরের ছবিটা রাত জেগে এঁকেছিল খুদেটা। ছুটির দিন আমার হাতে দিয়ে বলেছিল—

—এই ছবিটা তোমার জন্য এঁকেছি।

সেদিন খাওয়া জুটেছিল পৌনে চারটেয়। মাথাটা ধরে ছিল। হঠাৎ ছবির ভেতর থেকে এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস এসে জুড়িয়ে দিয়ে গেল। আরও বলেছিল,

—আমি তো এখন মানুষের ছবি আঁকতে পারি না . . . দিদির কাছে শিখে তোমাকে আর একটা ছবি দেব। স্বাভাবিকভাবেই আর দেখা হয়নি।

চারদিকে চিকিৎসক-নিগ্রহ দেখে এই ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল। হয়তো বছর দশেক বাদে ওই হাতটাই আমার কলার চেপে ধরবে, হয়তো ওই হাতেই খুবলে নেবে চোখ, হয়তো ওই হাতটাই চেপে বসবে গলায় . . . আর সবাই জানেন ডাক্তারদের পশার বাড়ে না।

আর যাঁরা আজ আমার পিঠ চাপড়ে দেন, লেখা পড়ে 'হৃদয় চিহ্ন' আঁকেন . . . তাঁদের মুখ, চোখ কাল বদলে যাবে। সেটাই স্বাভাবিক। সেটাই হওয়ার থাকে, সেটাই হয়।

ও পাড়ার কেষ্ট বাছাই করা তিন-চার-পাঁচ-ছয় অক্ষর ব্যবহার করে বলবে,

—ও . . . আমার বন্ধুর সেজো মেসোর পিসির ছোটো নাতনিটাকে শয়তানি করে মেরে ফেলেছিল প্রায়। . . . -র ক্যাল খাওয়াই উচিত। আমি নিজে দেখিনি বলে কি কিছু খবর পাই না নাকি? আমার বন্ধুর পাশের বাড়ির মদনের মেজো জেঠু নিজে আমাকে বলেছে, হুঁ . . .

তবু এই ছবিটা থেকে যাবে।

কোনো এক ঘর্মাক্ত সন্ধ্যার স্মৃতি নিয়ে।

তবু . . .

****

অপুষ্টিতে, রক্তাল্পতায়, অশিক্ষায় এখনই হাত রাখবার সময়
নিজের ঘাম, স্টেথো আর বিস্তীর্ণ বুক দিয়ে মিথোজীবিতায়
এখনই চিকিৎসক হওয়া যায়
তীব্রতম আঘাতে, বিষ্ঠা মাখা মুখে
আক্রমণকারীর মুখোমুখি-উঠতি নেতার ধমকানি চোখে
স্থির দৃষ্টি রেখে
এখনই যুক্তির তির ছুঁড়ে দেওয়া যায়
রড, ছুরি ও আরও যা যা আছে কুচক্রীর কাছে
সব অস্বীকার করে এখনই ভালোবাসা যায়।

(শেষ ক-টা লাইন যাঁর কবিতার অনুকরণে তিনি সম্ভবত ক্ষমা চাওয়ার তোয়াক্কা করেন না, অতএব . . .) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।

নিরীহাসুরের “মহা” সপ্তমী

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত

আজ “মহা” সপ্তমী। মানে, এ লেখা যখন আমি লিখছি, তখনও অবধি সপ্তমীই চলছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও আমার ভাগ্য “মহা” সুপ্রসন্ন . . . আমার তাই, নাইট ইমারজেন্সি ডিউটি। প্রথম যেবার আমার “মহা” পুজোর রাতে এইরকম একখান ডিউটি পড়েছিল, সেবার মনখারাপ হয়ে গিছল খুউউউব। দল কে দল রঙ্গিবিরঙ্গি মানুষের ঢল ভেদ করে ডিউটি যেতে কারই-বা ভালো লাগে! তারপর আস্তে আস্তে সবটাই অভ্যাস হয়ে গেল।

এবারও সেই অভ্যাসী মন নিয়েই ডিউটিতে জয়েন করেছিলাম ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত রূপে। অভ্যাসগত কারণেই জানতাম এরপর ঠিক কী রকমের রোগী আজ ভিড় জমাবে একের পর এক। এবং জমালও। হাত ভাঙা, পা ভাঙা, মাথা ফাটা, দাঁত ছিরকুটানো, বাইকবাহন যুবক-যুবতীর দল। সিংহভাগই মদ্যপ। অধিকাংশরই হেলমেট নেই। থাকলেও স্রেফ, পুলিশ ফাঁকি দেওয়া গাভাস্কারীয় স্কালক্যাপ। “হেলমেট পরোনি কেন?” বকাবকি করলেই বহুল পরিচিত অজুহাত—“স্যার বাড়ির জাস্ট সামনেই ঘুরতে গিছলাম।” মদ খেয়ে চালাচ্ছিলে কেন জিগ্যেস করলে—“পূজার দিন স্যার . . .”

তা ভালো। বাঙালির এমনিতেই এতদিন ছিল—বারো মাসে তেরো পার্বণ। এখন, বারো মাসে ঊনকোটি উৎসব। আর কে না জানে,

> “বিশ্বাস করো কাকিমা . . . এএকটু খেয়েছি . . . স্লাইট ডিংক . . . প্রমিস।” শুনে, আনন্দে আমার দু-চোখে জল চলে এল। এ পোড়া পুরুষ-জীবনে আমাকেও যে কেউ “কাকিমা” বলে ডাকবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

উৎসব মানেই ফুর্তি। ফুর্তি মানেই মদ। মদ মানেই ঘ্রিয়াও ঝাক্কাস বাইক। এসবের মধ্যে একটু-আধটু কোল্যাটারাল ড্যামেজ হতেই পারে বই কী। তাতে বলবার কিছুই নেই। বলছিও না। খালি দু-খানা গপ্পো শোনাই।

প্রথমটা, গতবছর জামাইষষ্ঠীর আগের রাত্রের। সেদিনও নাইট ইমারজেন্সি চলছে। ভোরের দিকটাতে একটা ট্রলি ঢুকল। মাথার ডান দিকটাতে গভীর ক্ষত। ব্যস। বাদবাকি আর সারা শরীরে একটিও আঁচড়মাত্র নেই। ভদ্রলোক আমার সামনেই মারা গেলেন মিনিট খানেকের মধ্যে। ভদ্রলোকের সঙ্গে “পেশেন্ট পার্টি” হিসাবে যিনি এসেছিলেন, তিনি সম্পর্কে পেশেন্টের শ্যালক হন। তাঁর মুখেই ঘটনাটা বিশদে জানতে পেরেছিলাম।

ভোর ভোর নাগাদ জামাই আর শ্যালক মিলে যাচ্ছিলেন মাংস কিনতে। টাটকা কচি পাঁঠা। জামাই বাবাজীবনের এটাই প্রথম জামাইষষ্ঠী। বাইকটা চালাচ্ছিলেনও তিনিই। এবং বলাই বাহুল্য—হেলমেটবিহীন। ভোরের হাওয়া বেজায় ঠান্ডা। শালাটির আবার সর্দির ধাত। কানে মাথায় তাই ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে, তিনি হেলমেট পরে বসেছিলেন ব্যাক সিটে। বড়ো রাস্তার মোড়ে হঠাৎ একখানা লরি বেয়াক্কেলে টার্ন নিল। বাইকটা রাস্তা থেকে নামাতে গিয়ে আলতো করে উলটে গেল। আপাতদৃষ্টিতে মামুলি দুর্ঘটনা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এইইই যে, রাস্তার ধারেই একটা পাথর বেয়াক্কেলের মতো পড়েছিল। তাইতে জামাই বাবাজীবনের মাথাখানি গেল ঠুকে। ব্যস। আর কী?

> বাঙালির এমনিতেই এতদিন ছিল—বারো মাসে তেরো পার্বণ। এখন, বারো মাসে ঊনকোটি উৎসব। আর কে না জানে, উৎসব মানেই ফুর্তি। ফুর্তি মানেই মদ। মদ মানেই ঘ্রিয়াও ঝাক্কাস বাইক।

জামাইবাবু প্রথম জামাইষষ্ঠীতেই মরে গেলেন। আর অক্ষতদেহ শ্যালক হাউমাউ করে কান্নাকাটি শুরু করলেন—“ইস্পিড কম ছিল সার . . . বিশ্বাস করেন . . . থাট্টিতে চালাচ্ছিল গাড়ি . . . মাথাটা একটু জাস্ট ঠুইকে গেছে . . .”

দ্বিতীয়টা আরও মজাদার।

এটা বছর তিনেক আগে কালীপুজোর রাতে। সেই মহা-অমাবস্যাতেও আমার “নাইট” ছিল। এটাও ভোরের ঘটনা। জলপাইগুড়ির দিকটাতে কালীপুজো নাগাদ একটু শীত শীতই পড়ে যায়। সারা রাত হুলিয়ে “অ্যাক্সিডেন্ট পেশেন্ট” ঢুকেছে। এখন একটু ফাঁকা। তখনও এ দেশের লোক প্রশ্ন করতে শেখেনি—“ডাক্তার তুমি

ঘুমোও কেন . . .।” আমি তাই সুযোগ বুঝে চেয়ারে বসেই ঝিমিয়ে নিচ্ছিলাম চাদর জড়িয়ে। হঠাৎ “এই বাঁ* . . . ছাড় না শ্লা . . . আমি ঠিক্কাচ্ছি . . . অলরাইট . . . আমি অলরাইট” চিৎকার শুনে যোগনিদ্রা কেটে গেল। তাকিয়ে দেখি—একটি বছর কুড়ির ছেলে। কপালে, থুতনিতে, গালে, কেটেকুটে গিয়ে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। স্বাভাবিক মানুষ হলে এতক্ষণে মাটিতে শুয়ে “বাবা রে মা রে” করে কাতরানোর কথা। কিন্তু ইনি “অলরাইট”। কারণ ইনি কারণবারি পান করিয়াছেন। এসব পেশেন্টকে হ্যান্ডেল করা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এক দাবড়ানি দিয়ে বললাম—“চুপ করে বোসো . . . দেখতে দাও ভালো করে . . . হেলমেট-ফেলমেট কেন যে পরো না . . . ।” ছেলেটা ধমকানি খেয়ে প্রথমটায় চুপ করে গেল। তারপর হঠাৎ কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে—“বিশ্বাস করো কাকিমা . . . এএকটু খেয়েছি . . . স্লাইট ডিংক . . . প্রমিস।” শুনে, আনন্দে আমার দু-চোখে জল চলে এল। এ পোড়া পুরুষ-জীবনে আমাকেও যে কেউ “কাকিমা” বলে ডাকবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। সেই জল মুছতে মুছতেই প্রেসক্রিপশনটা লিখছিলাম। কিন্তু পেশেন্ট পার্টির বোধ হয় আমার এতখানি আনন্দ ঠিক সহ্য হল না। হাউমাউ করে উঠল চিল্লিয়ে— “এই শালা, কাকে কাকিমা বলছিস? এটা ডাক্তারবাবু . . . হারামজাদা . . . ডাক্তারবাবু।”

আমাকে নাকি পেশেন্টকে, কাকে “হারামজাদা” বলল কে জানে। কারণ পার্টিটির অবস্থাও তথৈবচ। রোগীটা সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি হয়ে গেল।

. . . কী হয়েছে বলুন।” ভদ্রমহিলা আঁচল সরাতে সরাতে বললেন—“বাইক ধাক্কা মারসিল . . . কোল থেকে পইড়ে গ্যাছে গা . . . কাঁদতেসিল . . . এখন একটু ঘুমাইল” বাচ্চাটাকে দেখে চমকে গেলাম। আট দশ মাসের শিশু। এবং মৃত।

না। গল্প শেষ হয়নি। এট্টু বাকি আছে। ভর্তি করতে করতেই একটা হার্ট অ্যাটাক কেস এল। তার পিছু পিছু একটা—বিষ খাওয়া। ঝড়ের বেগে যখন সেসব সামলাচ্ছি, দেখি এক ভদ্রলোক এবং এক ভদ্রমহিলা জড়োসড়ো ভঙ্গিতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলার কোলে আঁচলে জড়ানো একটা বাচ্চা। বিষ-খাওয়াকে দেখতে দেখতেই জিজ্ঞাসা করলাম— “কী হয়েছে . . . ?”। ভদ্রলোক বিনীতভাবে বললেন—“আপনে এই পেশেনটা দেইখে নিন না . . . এমন কিছু হয় নাই।” তা দেখলাম বিষখেকোকে। তারপর হাত নেড়ে ডাকলাম— “আসুন . . . দেখি . . . কী হয়েছে বলুন।” ভদ্রমহিলা আঁচল সরাতে সরাতে বললেন—“বাইক ধাক্কা মারসিল . . . কোল থেকে পইড়ে গ্যাছে গা . . . কাঁদতেসিল . . . এখন একটু ঘুমাইল” বাচ্চাটাকে দেখে চমকে গেলাম। আট দশ মাসের শিশু। এবং মৃত। সরল সাদাসিধে বোকাহাবা দম্পতি এতক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলেন এই ভেবে যে—“এখন ঘুমাইল।”

অনেক অনেক পরে, তখন সাতটা সাড়ে সাতটা হবে বোধ হয়, আমার ডিউটি শেষ হতে আর ঘণ্টাখানেক বাকি, আছাড়িপিছাড়ি কান্নার শেষে ক্লান্ত হওয়া পিতাকে ডেকে আমি ঘটনাটা জানতে পেরেছিলাম পুরোটা—ঠাকুর দেখে হেঁটে ফিরছিলেন দু-জনে। কোলে—খোকা। পেছন থেকে একটা বাইক এসে ধাক্কা মারে মা-কে। বাচ্চাটা হাত ফসকে রাস্তায় পড়ে যায়। কোথাও কেটেকুটে যায়নি একটুও সেভাবে। শুধু . . . মরে গেল। আর বাপ-মা বুকে জড়িয়ে ভাবল—খোকার ব্যথা কমেছে। খোকা . . . ঘুমোচ্ছে।

শোকার্ত বাবাকে “হেড ইনজুরি” বোঝাবার মতো অবস্থা আমার ছিল না। বোঝাইওনি। কেবল, বাড়ি ফেরার ব্যাগ গোছাচ্ছি যখন, গ্রুপ ডি স্টাফ তাপস এসে বলল— “কেস শুনছেন তো সার? ওই কাকিমা-মালটাই পেছন থেইকা মারছিল . . . পুলিশ আসছিল একটু আগে . . .

কী বলছেন? কুসংস্কার? তা হোক গিয়ে। মাল খেয়ে হেলমেটবিহীন গাড়ি চালানোর চাইতে উপোস করে অঞ্জলি দেওয়া ঢের ভালো।

ছেলেটার এখনও নেশা কাটে নাই . . . বুঝতেই পারতেসে না এখনও, ও কী কইরা ফালাইছে . . .”

শুনলেন গপ্পো?

ভালো লাগল?

“এই তো সামনেই যাচ্ছিলাম . . .”, “মাথা চুলকায়”, “চুল উঠে যায়”, “ঘাম হয়”, এসব এখনও বলবেন, নাকি ফুল-হেলমেট পরবেন, এবার একটু ভাবুন। আর মাল খেয়ে গাড়ি চালাবেন কিনা? হেঁ হেঁ। থাক। কীইইই-বা বলি। স্বাধীনতার জয় হউক।

আসি। একটু পরে অঞ্জলি দিতে যাব বাড়ি ফিরে। এইবারের নির্ঘণ্ট মোতাবেক—উপোস করার ভারি সুবিধা। সকাল সকাল অঞ্জলি হবে। করেইনি। কী বলছেন? কুসংস্কার? তা হোক গিয়ে। মাল খেয়ে হেলমেটবিহীন গাড়ি চালানোর চাইতে উপোস করে অঞ্জলি দেওয়া ঢের ভালো। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, উত্তরবঙ্গের একটি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার।

শুভ দুর্গোৎসব

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক

একঘণ্টার ব্যবধানে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে প্রথমবার ভালোভাবে পাশ করলাম। দ্বিতীয়বার বিচ্ছিরিভাবে ফেল। তাও আবার ষষ্ঠীর সকালে।

আপনারা কী ভাবছেন, সেটা আমি জানি। দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীতে আবার কী পরীক্ষা? আর পরীক্ষা যদি থাকেও তাহলে একই প্রশ্নপত্রে পর পর দু-বার পরীক্ষা হয় নাকি? আর যদিও-বা হয় তাহলে কী করে . . .

যাক গে . . . আপনারা যা ভাবছেন ভাবতে পারেন। আমি বরঞ্চ কাহিনিতে ঢুকি।

ষষ্ঠীর সকাল দশটা নাগাদ রাউন্ড দিচ্ছিলাম ছেলেদের ২ নম্বর ঘরে। সেইসময় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ভর্তি হলেন। কোনো এক আশ্রমের পুজো দেখতে দেখতে মাথা ঘুরে পড়েছেন। খানিকক্ষণ জ্ঞান ছিল না।

দেখলাম ভদ্রলোককে। দিব্যি আছেন। বার বার বলছেন, "আমার কিছু হয়নি। শুধু শুধু ভর্তি নিল। ও ডাক্তারবাবু, বিকেলে আমায় ডিসচার্জ করে দিন।" আমার বেশ রাগ হল। ষষ্ঠী থেকে দশমী প্রতিদিনই ডিউটি। সেই ইন্টার্নশিপের সময় থেকে একই রুটিন চলছে। রাজ্যসুদ্ধু লোক সন্ধ্যে বেলায় শিয়ালদহে নেমে চলত ঠাকুর দেখতে। আর আমি ভিড় ঠেলে গুটি গুটি পায়ে এগোতাম মেডিক্যাল কলেজের দিকে।

প্রথম প্রথম কষ্ট হত। আজকাল আর হয় না। তেরো বছর ধরে পুজোয় ডিউটি করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে। আজকাল যেটা হয়, সেটা হল ফ্রাস্টেশন আর তার থেকে রাগ।

ভদ্রলোকের মুখে বাড়ি যাওয়ার কথা শুনে রেগেমেগে বললাম, "বাড়িই যদি যেতে চান, তাহলে ভর্তি হলেন কেন? হাসপাতালের একটা নিয়মকানুন আছে। একবার ভর্তি হলে ২৪ ঘণ্টার আগে ছুটি হবে না।" বলাবাহুল্য কেউ চ্যালেঞ্জ করলে এ-রকম কোনো নিয়মের প্রমাণ দেখাতে পারব না। নিজের সুবিধার জন্য এ-রকম নানা নিয়ম মাঝেমাঝেই আমি চালু করি। ভদ্রলোক রেগে বিড়বিড় করতে লাগলেন। তাঁর ছেলে বোঝাতে লাগলেন, "ডাক্তারবাবুতো ঠিকই বলেছেন। একটা দিন থাকো। পুজো তো গোটাটাই পড়ে রয়েছে।"

রাউন্ড প্রায় শেষের দিকে। এক হাঁপানি রোগীর পকেট থেকে গোটা প্যাকেট বিড়ি আর দেশলাই বের করেছি। সে বার বার বলছে, "মা কালীর দিব্যি, আমি বিড়ি খাই না। কেউ ভুল করে আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে।" লোকজন আজকাল মা কালীর নামে দিব্যি করেও দিব্যি মিথ্যে কথা বলছে। হঠাৎ ভদ্রলোকের ছেলের চিৎকার শুনলাম, "ডাক্তারবাবু, বাবা আবার কেমন করছে।" ছুটে গিয়ে দেখি ভদ্রলোকের সাড়াশব্দ নেই। বুকে স্টেথো বসালাম। নো হার্ট সাউন্ড। হঠ্যাৎ করে আ-সিস্টোল হয়ে গেছে। কী কেলেংকারি কাণ্ড। এই তো ভদ্রলোক একটু আগেই ঠাকুর দেখবেন বলে ছুটি নেওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি করছিলেন, আর কয়েক মুহূর্ত বাদেই স্বর্গে ঠাকুরদের পাশাপাশি বসে চা খাবেন। কিন্তু মুশকিল হল মাঝখানে একজন অসুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। যাদের প্রধান কাজ দেবতাদের ইচ্ছেয় বাগড়া দেওয়া।

অতএব শুরু হল আসুরিক প্রচেষ্টা। সি পি আর শুরু করলাম। সিস্টারদের এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। অধিকাংশ সময় ওনাদের কিছু বোঝাতে গেলে গলদঘর্ম হতে হয়। কিন্তু ইমারজেন্সির সময় ওনারা তাকানো মাত্র বুঝে যান, ডাক্তার কী চাইছেন। মুখেও বিশেষ কিছু বলতে হয় না। কখন অ্যাড্রিনালিন দিতে হবে আর কখন অ্যাট্রোপিন লাগবে। ওয়ার্ডের ছেলেটি অক্সিজেন লাগিয়েই ছুটল এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব আর আম্বু ব্যাগ আনতে।

আমাদের ছোটো হাসপাতাল। ওয়ার্ডে বাড়ির লোকের অবাধ যাতায়াত। রোগীর বাড়ির লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা বলাবলি করছে "হঠাৎ কী হল। এই তো একটু আগেই নিজে নিজে হেঁটে ভর্তি হল।" অন্য রোগীদের বাড়ির লোকজনও উঁকিঝুঁকি মারছে। সেসব দিকে আমাদের কারও খেয়াল নেই। ডাক্তার, সিস্টার, ওয়ার্ড বয় সকলে মিলে তখন একাগ্র মনে খুঁজে চলেছি প্রাণের স্পন্দন। আমাদের সরকারি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে ঝাঁ চকচকে কর্পোরেট হাসপাতাল, পরিকাঠামো আলাদা হতে পারে, কিন্তু লড়াইটা আদতে একই।

নীচু হয়ে চেস্ট কম্প্রেশন দিতে দিতে আমাদের সবেধন নীলমণি পালস অক্সি মিটারটির দিকে তাকিয়ে আছি। ওই তো পালস ফেরত আসছে। সামান্য সময়ের মধ্যেই রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক হয়ে গেল। এবং আমাদের অবাক করে ভদ্রলোক কিছুক্ষণের মধ্যেই কথা বলতে শুরু করলেন।

এ এক অদ্ভুত আনন্দ। চিকিৎসক এবং হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা

চিত্র ১. বস্ত্র বিতরণ উৎসবে

ছাড়া কেউ এই আনন্দ অনুভব করতে পারবেন না। রোগীর অবস্থা একটু স্থিতিশীল হলে আমি বললাম, "এক্ষুণি এনাকে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এনার হার্টের ভালোরকম সমস্যা আছে।" যথারীতি বাড়ির লোক বলতে শুরু করল, "এখানে রাখলে হয় না ডাক্তারবাবু। পুজোর মধ্যে কোথায় নিয়ে যাব। আর জি কর হাসপাতালে কি পুজোর মধ্যে ডাক্তার পাব?" আমি বললাম, "পানিহাটি হাসপাতালে এসে যদি ডাক্তার পান, তাহলে আর জি করে পাবেন না কেন?" অনেক বোঝানোর পরে বাড়ির লোক রাজি হল। তারা অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করতে গেল। আমি রেফার কার্ড লিখে অন্য রোগী দেখতে শুরু করলাম। ভদ্রলোককে অ্যাম্বুলেন্সের ট্রলিতে তোলা হচ্ছে। এমন সময় আবার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। আবার ছুটলাম। আবার লড়াই শুরু হল। কিন্তু দুর্গাপুজোর সময়ে অসুররা কি জেতে কোনোদিন?

এবারে সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। ভদ্রলোকের আর পুজো দেখা হল না।

ক্লান্ত মনে আর ঘর্মাক্ত শরীরে ওয়ার্ডে বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি আর বাড়ির লোকের কান্না শুনছি, সেই সময় গেটের ছেলেরা এসে ডাকল। অনাথ আশ্রম থেকে বাচ্চাগুলো এসে গেছে।

পানিহাটি হাসপাতাল থেকে এবারের পুজোয় স্থানীয় একটি অনাথ আশ্রমের মেয়েদের নতুন জামা দেওয়া হল। মূল উদ্যোক্তা হাসপাতালের অস্থায়ী ঠিকাকর্মীরা। যাঁরা অনেকসময় নিজেরাই পুজোর সময় সন্তানদের নতুন জামা কিনে দিতে পারেন না। আর কাপড় দেওয়া হল আমাদের হাসপাতালের অতিথিদের। যাঁরা মাসের পর মাস এই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। কয়েকজনের বাড়ির লোকের খোঁজ নেই। আবার কয়েকজনের বাড়ির লোক আছেন, কিন্তু তাদের খোঁজ পুজোর পরে পাওয়া যাবে। বিকেলে বাড়ি ফিরলাম। তারপর একটানা চেম্বার, বাড়িতে এবং বাইরে। রাত্রি এগারোটা অব্দি। ফিরেছি যখন দুই মেয়ে ঘুমন্ত। ওদের মায়ের আজ হাসপাতালে নাইট ডিউটি। আমার ষষ্ঠী চলে গেল। বাবা-মাকে ছাড়া আমার দুই সন্তানেরও ষষ্ঠী চলে গেল।

বিছানায় ওদের পাশে শুয়ে ফেসবুক খুললাম। এক চিকিৎসক বন্ধু ষষ্ঠীতে ডিউটি করার ছবি দিয়েছে। তার ছবির নীচের মন্তব্যগুলো পড়ছিলাম। একজন লিখেছেন, "ডাক্তাররা এতটাই অর্থলোভী, যে টাকার জন্য পুজোর মধ্যেও ডিউটি করে এবং সেটাকে মহৎ বলে প্রচার করে।"

চিত্র ২. চেম্বার ফাঁকি দিয়ে সপ্তমীর রাতে পাড়ার মণ্ডপে

সাথে সাথে আমি রাতে যেখানে চেম্বার করি সেই কাকুকে ফোন করলাম। "কাকু জেগে আছো। শোনো, কাল থেকে দশমী অবধি চেম্বার বন্ধ রাখব। খুব ইমারজেন্সি না থাকলে দশমীর পর আসতে বলো। আর খুব এমারজেন্সি থাকলে বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। বিকাল পাঁচটা থেকে সাতটার মধ্যে। তারপর আমি ভ্যানিশ হয়ে যাব।"

ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে, যিনি আমার বন্ধুর পোস্টে এ-রকম একটি কদর্য উক্তি করতে পেরেছেন। তাঁর জন্যই আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে গেল। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

পেঁপে পাতা

ডা. অনুপ বৈরাগী

১

তিনতলার ব্যালকনি থেকে কবিমাসি গলা বাড়িয়ে গোধূলিবেলায় ডাক ছাড়লেন "ছোট্টু! ছোট্টু। কোথায় তুই? স্কুলের ড্রেসটা তো ছেড়ে যা।"

এই মাসি কবিতা পড়েন না, কবিতা লেখেন না তাই কোনোভাবেই কবি নন। না পরিচয়ে, না হাবে ভাবে। শুধু পিতৃদত্ত নামের উল্লেখ করে কোথাও কোথাও কবিতা কথাটা লিখতে হয়। নাম কবিতা সংক্ষেপে কবি। নস্কর ভিলার সবচেয়ে ছোটো, একমাত্র বংশপ্রদীপ বা শিবরাত্রির সলতে যাই বলুন তিনি হচ্ছেন ছোট্টু শুভ নাম সায়ন। স্কুল থেকে ফেরার পর ব্যাগটাকে সটান সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে ধাঁ। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর অবশেষে এই কিছু আগে তেনার পদধূলি পড়েছে দু-কামরার ড্রইং রুমে।

"কোথায় ছিলি এতক্ষণ! হাতে পায়ের এ কী অবস্থা। ধুলো কাদা।" কপালে সাড়ে পাঁচটা ভাঁজ ফেলে মাসি গজগজ করতে করতে বলে চলেছেন—

"জীবনটা আমার কয়লা হয়ে গেল। যাদের গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা তাদের ঘরে এমন হয় না। একটা বাঁদর কপালে সারাক্ষণ নাচছে। বাবা আসুক। আর নয়। অনেক হয়েছে। এবার হোস্টেলে পাঠাতে হবে।"

ছোটোবেলা থেকে এই সংলাপ বহুবার অবিকৃত শোনা গেছে। ক্লাস নাইন-এ উঠে তাই বিশেষ হেলদোল নেই ছোট্টুর। মুচকি হেসে ড্রেস চেঞ্জ করতে করতে বলল "তুমি কি জানতে চাও কোথায় ছিলাম এতক্ষণ? নাকি গজগজং সংলাপন চলতে থাকবে! আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসি?"

"না। তুমি বাথরুম যাবে না। বলো কী রাজকার্য করছিলে এতক্ষণ।"

"গতকাল বৃষ্টি হয়েছে। আজ তাই জমা জল ফেলতে গেছিলাম। ভাঙা টব। ভাঙা বালতি। দই-এর ভাঁড় . . . কী কী সব ফেলে রেখেছে চারদিকে। ডেঙ্গুর মরসুম চলছে কারও খেয়াল নেই! জানো পাশের বাড়ির আদিত্যর ডেঙ্গু ধরা পড়েছে?"

"তো তোমার এই আদিখ্যেতার মানে কী? পৌরসভার কাজ করতে তোমাকে কি ঠিকে দিয়েছে! আর বাড়ির আশপাশে জল পরিষ্কার করলেই কি ডেঙ্গু গায়েব হয়ে যাবে!"

'সে কথা কে বলেছে। তবে প্রতিরোধ কিছুটা নিশ্চয়ই করা যাবে। ডেঙ্গুর মশা একশো মিটারের বেশি উড়তে পারে না। ঘরের আশপাশের জমা জলেই জন্মানো মশা রোগ ছড়ায়। তাই আমাদের কারুর ডেঙ্গু হলে তার জন্যে দায়ি থাকব আমরাই। সপ্তাহে একদিন জমা জল পরিষ্কার করলেই কেল্লা ফতে!! আর কী জানি হয়তো আদিত্যর ডেঙ্গু হবার জন্য আমরাই দায়ী!"

"থাক থাক। অনেক হয়েছে। তো হঠাৎ তোমার এই সুমতির কারণ। ঘরের কুটোটা যে সরায় না তার এত সমাজসেবার হিড়িক?"

"আজ স্কুলে রেহান স্যার সোশাল সায়েন্স-এর ক্লাসে বলেছিলেন। তাই ভাবলাম আর কী!"

"বেশ। সমাজসেবা অনেক হয়েছে এবার ফ্রেশ হয়ে টিফিন করে আমাকে উদ্ধার করো!"

". . . আর হ্যাঁ। ডেঙ্গুর মশা কিন্তু দিনে কামড়ায়। জানো মা এডিস মশাকে টাইগার মসকুইটো বলে। . . . কেন জানো? ওদের গায়ে ডোরাকাটা দাগ থাকে। বাকিরা রাতের অন্ধকারে কামড়ায়। কিন্তু এডিস-এর বাঘের মতো সাহস। তাই দিনের বেলায় শিকার করে। হা হা . . ."

২

সকাল সকাল ঘুম ভাঙল আজ। বাড়িতে আসলে আমার ঘরে সকাল হয় একটু দেরিতে। সত্যি কথা বলতে সকাল হয় আমার মর্জিতে। সকালের সূর্য বাবাজীবনের আলো পর্দা টেনে যথাসম্ভব আড়াল করে রাখেন আমার মা-জননী। কাজের সুবাদে বাইরে থাকার কিছু তো অ্যাডভান্টেজ দিতে হবে নাকি। তাই নো ডিস্টার্ব। তবে আজ একটু আলাদা। ছোটো মাসি জরুরি তলব করেছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে হসপিটাল যেতে হবে। জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছে ছোটে মিঞা মানে আমাদের ছোট্টু। সাসপেক্টেড ডেঙ্গু। প্লেটলেট কমে গেছে। হাউ হাউ করে মাসি নাকি বলেছে "এই সেদিন নিজে হাতে জমা জল পরিষ্কার করছিল আর তারই কিনা শেষে ডেঙ্গু! ভগবান বলে কি কিছু আছে। দিন দিন পুজা করে এই ছিল পোড়া কপালে . . . ?"

যাক গে। দোমড়ানো সকালটাকে টেনেটুনে সোজা করার চেষ্টা

বৃথা। অগত্যা ফাস্টিং ব্রেক করে বাদুড়ঝোলা লোকাল ট্রেনে যাদবপুর পর্যন্ত পৌঁছোলাম। নিপাট জামা ইন থেকে আউট হয়ে গেছে। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের মাথার ঘাম জামার গায়ে লেপটে অসম্ভব ম ম গন্ধ বিজ্ঞাপনী সুগন্ধিকে ছাপিয়ে গেছে বলাবাহুল্য। অতএব কোম্পানির "একবার লাগলেই চব্বিশ ঘণ্টার গ্যারান্টি"-কে ঠিক কী বিশেষণে নিবেদন করা যায় ভাবতে ভাবতে হসপিটাল পৌঁছে গেলাম।

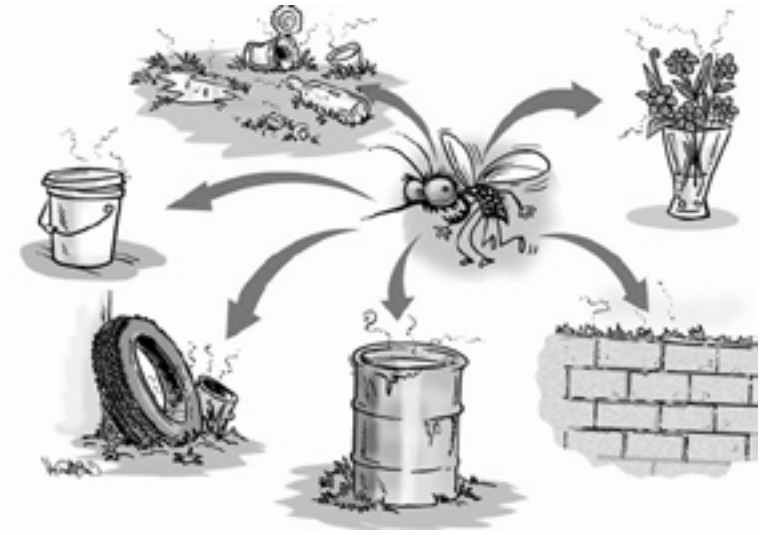

এই হসপিটাল আর ধর্মস্থানের বেশ একটা আত্মিক যোগাযোগ আছে বলে আমি মনে করি। শেষ সময়ে এই দুই জায়গায় যাতায়াত বেড়ে যায়। বিশ্বাস অবিশ্বাসের সেই ধূসর করিডোর দিয়ে যাতায়াত করে কালো টাকার কারবারি। সরকারি হসপিটাল বাদ দিলে বেসরকারি হসপিটাল আর মন্দিরের যে দিকটা আমার সবচেয়ে পছন্দের তা হল "পিনপতন চুপকথন" মানে পিন ড্রপ সাইলেন্স যাকে বলে। থমথমে মুখে রোগীর পরিবার। গম্ভীর মুখে ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মীরা। যার অন্যথা এবারেও হয়নি।

"আমার কী হল, আমার কী হবে" গোছের প্যানপ্যানানি ওয়াক ওভার করে তিনতলার ওয়ার্ড-এ পৌঁছোলাম। ছোট্টু মুখটাকে বেজার করে কিছু একটা চিবাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলাম কচি পেঁপে পাতা। ডেঙ্গুর সুবাদে মোটামুটি সবাই জেনে গেছে পেঁপে পাতার রসে আছে সেই বিশল্যকরণী যার জাদুতে রক্তে প্লেটলেট হুড়হুড় দাবাং দাবাং করে বাড়ে। আমাকে দেখে ও বেশ একটু সাহস পেয়েছে। বলেই ফেলল "দাদা এসে গেছে! মা তুমি এবার একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো।"

আমার জিম্মায় পেঁপে পাতার বাটি রেখে পাতা চিবানো সুপারভাইজর করে কবিমাসি এইমাত্র নেমে গেছে।

"দাদা! বাঁচালে তুমি। এই পাতাগুলো তুমি পকেটে পুরে নিয়ে যাও। তুমি ভালো করে জানো আমি তেতো খেতে কীরকম অপছন্দ করি। গত তিনদিন পাতা চিবোতে চিবোতে চোয়াল ব্যথা, মুখ তেতো। আমি আর নিতে পারছি না। তুমি ডক্টর আঙ্কেল-এর সাথে কথা বলো। আমি বাড়ি যাব। আমি একদম সুস্থ।"

ডক্টর দাশগুপ্তর সাথে কিছুক্ষণ কথা বললাম। যার সারমর্মে কিছু অভিযোগ আর রোগের কিছু জানকারি পেলাম। গত কয়েকদিন যাবৎ কবিমাসির অভিযোগ তেমন কিছু ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না। ডক্টর দাশগুপ্ত বললেন এটা একটা ভাইরাল ফিভার। এর স্পেসিফিক কোনো ট্রিটমেন্ট নেই। যা কিছু আছে পুরোটাই রোগের উপসর্গ অনুযায়ী মানে symptomatic ট্রিটমেন্ট যাকে বলে। শরীরে যাতে জলের ঘাটতি না হয়, জ্বর এলে জ্বরের ওষুধ, আর প্লেটলেট নিয়মিত চেক করা। রক্তক্ষরণ হলে প্লেটলেট সাপ্লিমেন্ট মানে গোদা বাংলায় সাদা রক্ত দিতে হবে (পেঁপে পাতার কোনো কেরামতি নেই)। সুতরাং ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ ছাড়া বিশেষ কিছু করণীয় নেই। ভাইয়ের প্লেটলেট ৫৯ হাজার এসেছে আজকের সকালের রিপোর্ট-এ। এমনিতে তেমন কিছু ভয় আপাতত নেই বলে আশ্বস্ত করলেন। মোদ্দা কথা বাড়ির বাকি লোকজনদের বোঝাতে হবে এই কথাগুলো।

ডক্টর দাশগুপ্তর সাথে সাক্ষাৎ সমাপন করে নীচে নামতেই হাউমাউ করে সবাই হামলে পড়ল আমার ওপর। অতএব বাকি কিয়দক্ষণ সদ্যপ্রাপ্ত জ্ঞানের সম্প্রচার করতে হল বলাই বাহুল্য। উফফ! আজকের মতো আমার ডিউটি শেষ। বাড়ি ফিরতে হবে ভাবতেই সকালের লোকাল ট্রেনের দুর্বিষহ জার্নির কথা মনে করে মুখটার যে বিকৃতি হয়েছে ছোট্টুর পেঁপে পাতা চিবানো মুখটা আরও একবার মনে পড়ে গেল। পকেট থেকে ফেলার সময় একটা পাতা কৌতূহলের বসে মুখে দিয়েছিলাম! বাকিটা কী হল সে ইতিহাস গোপন থাকা ভালো। আপাতত লোকাল ট্রেন, বাদুড়ঝোলা বগি আর আমার ইস্ত্রি-করা জামার কথা ভেবে চোয়াল যথাসম্ভব ঝুলে গেল।

৩

আসানসোল যাবার ট্রেনে আপাতত বসে। বসের কাছে তিনদিনের ছুটি ভিক্ষে করে বহু মেহনতে একদিন মঞ্জুর হয়েছিল। আপাতত ছোটে মিঞা অনেকটা সুস্থ। প্লেটলেট বাড়তে শুরু করেছে। জ্বর নেই। পেঁপে পাতা বদলে পেঁপের ঝোল বরাদ্দ হয়েচে দু-বেলা। রক্ষে এ যাত্রায়। শুধু আসার সময় বাড়ির চারপাশের জমা জল ফেলতে গিয়ে ছোটের কাছে মনে মনে মাথা হেঁট করলাম। আমরা জানি, আমরা বুঝি শুধু প্র্যাকটিসটা না করার জন্য ডেঙ্গু প্রতিবছর কতজনকে কাবু করে। অথচ একটু মোটিভেশনের অভাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব কেমন এড়িয়ে চলি। আর ভুল হবে না! সপ্তাহে একবার আশপাশের জমা জল পরিষ্কার করতেই হবে! না হলে পেঁপে পাতা কপালে নাচছে, সে তাতে প্লেটলেট বাড়ুক বা না বাড়ুক। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখাটি এর আগে জিরো বাউন্ডারি কবিতা নামে একটি ওয়েব ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

ডা. অনুপ বৈরাগী, এমবিবিএস, সরকারি চিকিৎসক, এখন রেডিয়োলজিতে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা করছেন।

বই পড়া

সত্যি হলেই গল্প হয়

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

ঐন্দ্রিল ভৌমিক, *সত্যি বলছি গল্প নয়,* সুমুদ্রণ, কলকাতা ৫১, মূল্য ৫৫ টাকা

লেখকের দেওয়া বইয়ের নামের পালটা শিরোনামটা দিতেই হল। কেননা ব্যক্তিমানুষের কল্পনা তার নিজস্ব পরিসরেই ঘোরাফেরা করে। ফলে তার কল্পনার (যে কল্পনাও আবার প্রধানত তার পরিবেশ থেকেই আহরিত) দৌড় আর কত দূর হবে! যেমন মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গাঁ খড়গ্রামে লেখকের প্রথম পোস্টিং। লেখকের চেনা পরিবেশ থেকে জায়গাটা একদমই আলাদা। তাই সেখানকার নিসর্গ, নানা ধরনের মানুষজনের সঙ্গে তাঁর যখন নানাভাবে যোগ গড়ে উঠতে থাকে; তখন সেই সত্যিগুলোই আমাদের কাছে অনাস্বাদিত গল্পের খনি হয়ে ওঠে। তাই বলছিলাম—সত্যি হলেই গল্প হয়।

ফেসবুকে গল্প পোস্ট করতে করতে লেখক যে 'কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত' হওয়ার মতো আস্ত একজন গল্প-লিখিয়ে হয়ে উঠবেন; সে কথাটা তাঁর মতো আমাদেরও বিস্মিত করে বই কী! তবে তিনি যে এটিকে একটি 'সম্পূর্ণ বই' ভেবেছেন, তাতে আমাদের আপত্তি আছে। কেননা মাত্র ৬৪ পৃষ্ঠার এই চটি বইতে আমাদের মন ভরে না। তাঁর সত্যি গল্পের ঝাঁপিতে কি আর কিছু নেই? হতেই পারে না। আমরা তাই লেখকের থেকে আরও এমন অনেক 'মানুষের গল্প' শোনার জন্যে কান পেতে আছি।

মানতেই হয়, এত অল্প বয়সে এমন ঈর্ষণীয় লিখনশৈলী কী করে তিনি আয়ত্ত করলেন! যেন পড়ুয়ার সঙ্গে রকে বসে আড্ডা মারছেন। গড় গড় করে বলে যাচ্ছেন তাঁর মনের যত কথা। আসল আড্ডার সঙ্গে একটাই তফাত—আড্ডায় সকলেই শ্রোতা ও বক্তা, আর এখানে তিনি একাই বলে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আড্ডা মারার লোভে 'পুস্তক পর্যালোচনার' ভেক ধরে সেই খামতিটা পুষিয়ে নিচ্ছি।

এধার-ওধার কথা হল বেশ খানিক, এবার গল্পগুলোয় ঢুকে পড়া যাক। ডা. অরুণ সিং তাঁর একটা নিবন্ধে বলেছেন: ' . . . কোন স্কুল নয়, জন্মের প্রথম তিন বছরে একটা শিশুর স্বাস্থ্যের বিকাশের উপরেই নির্ভর করে কোনও দেশ বা জাতি কোথায় যাবে। . . . ' (পৃ. ১০-১১, *সবার জন্য স্বাস্থ্য,* গুরুচণ্ডাল৯ প্রকাশনা) ওই নিবন্ধেরই আর এক জায়গায় তিনি বলছেন: 'মানুষের প্রথম ৫ বছরে বুদ্ধির পুরো বিকাশটা হচ্ছে, যার ফলে আমি বা আপনি এখানে বসার অধিকার পাচ্ছি।' (পৃ. ২১, তদেব) সকলেরই জানা, মগজ এভাবে পরিণত হতে চাই পুষ্টি। সে পুষ্টি এদেশের গরিবের কপালে জোটে না। 'কপালে' না বলে বলা ভালো দেশের কুচক্রী মুষ্টিমেয় ধনীদের জন্য জোটে না। তবু 'আলোর গল্প'-এর সেই অজ পাড়াগাঁয়ের গরিবের ছেলে জয়েন্টে মেডিক্যালে চব্বিশ র‍্যাঙ্ক করতে পারে! এমন একটি ছেলের নাম লেখক ভুলে গেলেন কী করে, ভেবে একটু দুঃখ হয় বই কী। তবে লেখক রেফারেন্স বই, স্পেশাল কোচিং ইত্যাদির কথা তুলেছেন বটে কিন্তু যে কথাটা বলেননি, সঠিক পুষ্টি পেলে আরও কত শত শত তথাকথিত গরিবের ছেলে-মেয়েরা উচ্চতর শিক্ষার অধিকার অর্জন করে নিতে পারত। তখন উচ্চশিক্ষায় স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মৌরসিপাট্টা ঘুচে যেত। 'পুরানো সেই দিনের কথা'য় তিনজন মানুষ—কালুদা, খোকন আর শেখ জমিরুল ডাক্তারের কোয়ার্টারের আড্ডায় গল্প যেমন করত তেমনি তুমুল তর্কে মেতে উঠে তাদের গলা চড়ত। কেননা এদের একজন সিপিএম, আর একজন তৃণমূল, তৃতীয় জন গোঁড়া কংগ্রেস। তবুও লেখক জানতেন: 'কাল বিকেলেই আবার তিনজন গুটি গুটি পায়ে হাজির হবে। রাজনীতি যাই করুন, পরস্পরকে

না দেখে তারা একটা দিনও থাকতে পারবে না।' মানুষে মানুষে যোগটাই যে মানুষের আসল পরিচয়; গায়ে সেঁটে দেওয়া কোনো লেবেলে তার ঠিক পরিচয়টি মেলে না—এই কথাটাই লেখক অদ্ভুত মুনশিয়ানায় ভারি সহজভাবে আমাদের জানিয়ে দিলেন।

'ভালোবাসার গল্প' লেখকের সঙ্গে প্রবীরদা ও রাজীবের যোগের গল্প। গল্পের শেষে বুড়িমার কথাটা আমার খুব মনে ধরেছে। রাজীব যখন জিগেস করে: 'ডাক্তারবাবুরটা কই বুড়িমা?' তখন 'ময়লা কাপড় পরা খুনখুনে বুড়িটা অম্লান বদনে বলে দিল, "তুমি ভালোবেসে দুটো কথা বল। আর ঐ ডাক্তার বড় খ্যাঁক খ্যাঁক করে বাপু। অমন খেঁকুড়ে মানুষকে আমার ভগবানের প্রসাদ খাওয়ানোর ইচ্ছা নাই।" ' তারপর থেকে লেখক খ্যাঁক খ্যাঁক একটু কম করা চেষ্টা করছেন। এ থেকে এখনও যাঁরা ভালো কিন্তু খেঁকুড়ে ডাক্তার তাঁরা নিজেদেরকে একটু শুধরে নিতে চাইলে মন্দ হয় না।

'ঋণ শোধ' এ-বইয়ের একটা সেরা গল্প। গরিবদের সম্পর্কে মধ্যকোটি মানুষের একটা সন্দেহবাতিক আছে। ওরা নাকি কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে মধ্যকোটিদের ঘর-গেরস্থালির এটা-ওটা, টাকাটা-পয়সাটা যখন-তখন হাতিয়ে নেয়। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার কোনো প্রমাণ মেলে না। ঐন্দ্রিল মধ্যকোটির এই ধারণার মুখে একেবারে ঝামা ঘষে দিয়েছেন। বুড়ির ছেলে মারা গেছে। বুড়ি ডাক্তারকে সেই খবর দিতে এসে টাকা গুনছেন ডাক্তারের দেনা শোধ দেবেন বলে। এটাই গরিবের স্বাভাবিক চরিত্র—তা তাকে মধ্যকোটির মানুষরা যতই কলুষিত করার চেষ্টা করুক না কেন।

মানুষের হাসপাতালে বাছুরের চিকিৎসা, পাড়া-ক্রিকেটের বিপক্ষের দুটো মেয়ের দাপটে গোহারান হারা কিংবা মদন ঘোষের অ্যাট্রোপিন সাইকোসিস হওয়ার ফলে যেসব ঝামেলা পাকিয়ে উঠেছিল; সেখানে পড়শি রোগীর এক মায়ের দার্শনিক মন্তব্য: 'বিয়া না দিলে একবারই বিষ খাবে। আর বিয়া দিলে বারবার।'—এইসব আপাত মজাদার পর্যবেক্ষণ কিন্তু ভেতরের করুণ সামাজিক পরিবেশের উন্মোচনে ঐন্দ্রিলের ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের আর কোনোরকম সংশয় থাকে না।

'বুড়ো, যক্ষ্মারোগ এবং শোল মাছ'-এ বুড়োর ছেলের মৃত্যু ও শোল মাছের মুক্তি আমাদের একেবারে অন্যরকম ভাবনায় জারিত করে। 'হাসপাতালের অতিথি'-তে মকিনার হাসপাতালকে ঘরবাড়ি করে তোলা, আবার শহরের হাসপাতালে রোগীর ছুটি লিখে দিলেও রোগীর বাড়ির লোকজনের কারও নিতে না আসা কিন্তু রোগী মরে গেলেই ভালো ভালো পোশাক পরা রোগীর বাড়ির লোকজনের আনাগোনা আর তাদের তাচ্ছিল্যভরা মন্তব্য: 'এইসব সরকারি হাসপাতালে কোনো চিকিৎসা হয় না। তাদের রোগী সম্পূর্ণ বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে।'—ঐন্দ্রিলের কানে আসে। গল্পের শেষে তাঁর আবেদনটি মধ্যকোটি সমাজের মানবিকতাহীন জীর্ণ কঙ্কালটির পরিচয় পেয়ে আত্মগ্লানিতে ভোগা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের অসুখ-বিসুখ হলে কী ভয়াবহ সংকট তৈরি হয় তা ধরা আছে 'অসুখ বিসুখ'-এ। 'অন্ধকারের গল্প'-এ বন্যাত্রাণে ফিনাইল (কেননা হাসপাতালে কেবলমাত্র দেদার ফিনাইলই মজুত ছিল) নিয়ে যাওয়ার পরিণাম পড়ে আমাদের মুখে আর কথা জোগায় না। অকথ্য গালিগালাজ শুনেও দাদাটি যখন ঐন্দ্রিলকে বলেন যে বন্যার সময় আর কিছু না হোক দু-এক বস্তা মুড়ি নিয়ে যেতে তখন বন্যা বিধ্বস্তদের বেহাল দশাটা যেন আমাদের চোখের সামনে উৎকটভাবে উঠে আসে।

'কেন আমি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে যাই না' গল্পটিতে কাঙালি ভোজনের জায়গায় গিয়ে ভদ্রলোক সকলের সঙ্গে ঐন্দ্রিলের পরিচয় করাতে গিয়ে বলেন: 'ইনিই বাবার ডাক্তারবাবু। এনার হাতেই বাবা মারা গেছেন।' তখন এক দুঃস্থ মহিলা তার ছেলেকে বললেন: 'শিগগিরি ডাক্তারবাবুকে পেন্নাম কর। ওনার জন্যই আজ আমাদের পেট ভরে খাবার জুটছে।' এইখানে গল্পের ক্ল্যাইম্যাক্স চরমে ওঠে। 'সাদা তোয়ালে' গল্পে রক্তদান শিবিরে কেন গরিব মানুষ রক্ত দিতে যান তার কাহিনি শুনে আমাদের কি একটু শক লাগে! হাসপাতালে ডাক্তারির ধকল সামলেও তাদের মধ্যে যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রণোদনা কাজ করে যায় তার নজির মেলে 'পাণিহাটি হাসপাতাল, উন্মেষ, ডাঃ খান এবং সুপারম্যান' গল্পে।

শেষ কথাটা এই: আমাদের প্রথম ও শেষ পরিচয়—আমরা মানুষ। মাঝে পেশাগতভাবে, আদর্শগতভাবে, দেশগতভাবে—এইরকম নানা-ভাবে আমাদের নানা খণ্ডিত সত্তা-পরিচয় গড়ে ওঠে। সেগুলোও সত্যি বটে কিন্তু সবটা নয়। ঐন্দ্রিলের গল্পেই যেমন আছে, কালুদা, খোকন, জহিরুল—তিনজনে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোক। তারা তর্ক-বিতর্ক করে ঝগড়াঝাঁটি করে কিন্তু একে অন্যকে না দেখে একটা দিনও থাকতে পারে না। আর সেখানেই তাদের রাজনৈতিক পরিচয় গৌণ হয়ে মানুষের পরিচয়টাই বড়ো হয়ে ওঠে। ঐন্দ্রিল পেশায় ডাক্তার ঠিকই, তিনি কত বড়ো ডাক্তার, রোগীর কাছে 'ভগবান' নাকি 'শয়তান' তা আমি জানি না, কিন্তু এই বই পড়ে আমার মনে হয়েছে, তিনি একজন বড়ো মাপের মানুষ। তিনি আমার মতো পড়ুয়াদের জন্যে আরও লিখুন। কিন্তু এবার আর 'চটি বই' নয়; একটা মোটাসোটা বই চাই। সব কিছুই খুব ভালো এরকমটা তো আর বাস্তবে ঘটে না। এ-বইয়ের ক্ষেত্রেও ঘটেনি। বইটির পত্রবিন্যাস ও মুদ্রণকার্যে অভিজ্ঞ বই-করিয়েদের পরামর্শ নিলে ভালো করতেন। দু-একটা ছাপার ভুল চোখে পড়ল। যেমন 'ইনট্রান', কথাটা সম্ভবত 'ইনটার্ন' হবে; আর এক জায়গায় আছে 'ডাক্তাবাবু' (পৃ. ৫৩)। এসব ছোটোখাটো ভুল শুধরেই নেওয়া যায়। একটা চটি গল্পের বই পড়ে যে এত তৃপ্তি পাওয়া যায়, সে কথাটা শেষপর্যন্ত লেখকের কাছে কবুল করতেই হয়।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

পুস্তক সমালোচক একজন স্বাধীনজীবী পুস্তক সম্পাদক।

টুকরো খবর

ভারতে কুষ্ঠ বাড়ছে

২০০৫-এ ভারত কুষ্ঠমুক্ত হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল, অথচ ২০১৬-য় ১ লক্ষ ৩০ হাজার নতুন কুষ্ঠরোগী চিহ্নিত হয়েছে, যদিও বিশেষজ্ঞদের মত এই হিসাবে সংখ্যা কম করে দেখানো হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত জার্নাল *ল্যান্সেট*-এ সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে ২০০৫-এর ঘোষণার পরে সরকার কুষ্ঠ-নিয়ন্ত্রণে নজর দেয়নি।

২০০৮-২০১১ সময়কালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আই সি এম আর) সার্ভে করেছিল, তাতে দেখা যায় প্রতি বছর প্রায় আড়াই লক্ষ নতুন কুষ্ঠ রোগী ধরা পড়ছেন।

গত এক বছরে দেশে মোট কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৬.৪%, মহিলা কুষ্ঠরোগী ৮.৭৪%, শিশু কুষ্ঠরোগী ৩.৫৪%। যদিও কুষ্ঠ থেকে অঙ্গবিকৃতি কিছুটা কমেছে—১০.৩৬%।

দেশের যে ৬টি রাজ্যে কুষ্ঠের প্রকোপ বেশি তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। উত্তর প্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়ের পর এর স্থান। গত বছরে পশ্চিমবঙ্গে ১১,২৩৬ নতুন কুষ্ঠরোগী ধরা পড়েছেন, যা তার আগের বছরের তুলনায় ৩৭.৫৩% বেশি।

কুষ্ঠ এক দীর্ঘকালীন সংক্রামক রোগ। মাইকোব্যাকটিরিয়াম লেপ্রি-ঘটিত এই রোগের জীবাণু ছড়ায় মুখ ও নাক থেকে জলবিন্দুর মাধ্যমে। চামড়া, স্নায়ু ও চোখ এই রোগে আক্রান্ত হয়। স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অঙ্গবিকৃতিও হতে পারে এই রোগে।

কুষ্ঠরোগীদের যে সামাজিক বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়, তা বিবেচনা করে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে কুষ্ঠরোগীদের যেন বাছ-বিচারের শিকার হতে না হয় এবং তাঁদের যেন যথাযথ পুনর্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু সরকার কবে তাঁদের দিকে নজর দেবে সেটাই প্রশ্ন।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ইউনাইটেড নেশনসের রিপোর্ট বলেছে, ভারতে নবজাতকের মৃত্যুর হার কমেছে, কমেছে কন্যা-শিশু মৃত্যুর হারও

ইউনাইটেড নেশনস ইন্টার-এজেন্সি গ্রুপ ফর চাইল্ড মর্টালিটি এস্টিমেশন তার রিপোর্টে জানিয়েছে ২০১৭-য় এক বছরের কমবয়সি শিশুদের মৃত্যুর হার গত ৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২০১৭-য় ৮ লক্ষ ২ হাজার নবজাতকের মৃত্যু হয়, যেখানে ২০১৬-য় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৬০ হাজার। ইউনিসেফের প্রতিনিধি ইয়াসমিন আলী হকের মতে ভারতে হাসপাতালে প্রসবের সংখ্যা বৃদ্ধি, অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী টিকাকরণ ব্যবস্থার কারণে ভারতে শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এক বছরের কমবয়সি শিশুদের মৃত্যু হার এখন প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুজন্মে ৪৪।

উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে কন্যাসন্তান ও পুত্র সন্তানের মৃত্যুর হারে বৈষম্যও। ২০১২-য় প্রতি ১০০ কন্যাশিশু মৃত্যু পিছু পুত্রশিশু মারা যেত ৫৬ জন; যাতে কন্যাশিশুর যত্নের প্রতি সমাজের অবহেলা বোঝা যায়। ২০১৭-য় ১০০০ জীবিত পুত্রশিশু জন্ম পিছু মৃত্যু ৩৯ আর

১০০০ জীবিত কন্যাশিশু জন্ম পিছু মৃত্যু ৪০। অর্থাৎ অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়েছে।

রাষ্ট্র সংঘের সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ২০১৭-য় সারা পৃথিবীতে ৬৩ লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয়—প্রতি ৫ সেকেন্ডে ১টি মৃত্যু। এর মধ্যে ৫৪ লক্ষ মৃত্যু ৫ বছরের কমবয়সি শিশুদের। ইউনিসেফের আধিকারিক লরেন্স চন্ডী বলেন এই ৫৪ লক্ষ মৃত্যুর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি সাহারা মরুভূমির নীচের আফ্রিকায় আর ৩০% দক্ষিণ এশিয়ায়। এই ৫৪ লক্ষের মধ্যে ২৫ লক্ষ আবার এক মাসের কমবয়সি শিশু। গ্রামাঞ্চলে একমাসের কমবয়সি শিশদের মৃত্যুর হার আবার শহরাঞ্চলের তুলনায় ৫০% বেশি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রসবের সময় জটিলতা, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, এক মাসের কমবয়সি শিশুদের রক্তে সংক্রমণ এবং ম্যালেরিয়াই মৃত্যুর কারণ। ইউনিসেফ আরও বলেছে পরিষ্কার জল, নিকাশি ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ এবং টিকাকরণের মাধ্যমে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা অনেকটা কমিয়ে আনা যায়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

পি সি-পি এন ডি টি আইনে নতুন পরিবর্তন: আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে পারবেন এবার আয়ুর্বেদ-সিদ্ধা-উনানী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা?

পি সি-পি এন ডি টি আইনে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রক একটি পাবলিক নোটিশ জারি করেছিল। সেই নোটিশের ভিত্তিতে আলোচনা করে ভারতীয় চিকিৎসা কেন্দ্রীয় পরিষদ। ২৭ আগস্ট পরিষদের কার্যকরী পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা ও উনানীর স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের এই আইনে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য করার জন্যে এবং ছয় মাসের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ট্রেনিং-এর জন্য বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করা হবে। প্রস্তাবিত ডিগ্রিগুলির মধ্যে আছে এম ডি/এম এস (আয়ুর্বেদ) স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিতন্ত্র, এম ডি (সিদ্ধা) সুল, মাগালির মারুথুভাম এবং এম ডি (উনানী) আমরাজে নিসওয়ান য়া ইলমুল কাবালা। ভারতীয় চিকিৎসা কেন্দ্রীয় পরিষদ ১২ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে লিখিতভাবে এই সুপারিশ জানিয়েছে। আশা করা যায় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এই সুপারিশ গ্রহণ করলে দেশে সোনোলজিস্টের অভাব মিটবে। ছায়া এবং বিকিরণ বিজ্ঞানে এম ডি (আয়ুর্বেদ) এম ডি (রেডিওডায়াগনোসিস) এর সমতুল্য করা হোক এই সুপারিশ করা হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

নির্বাচিত মেডিক্যাল কাউন্সিলের স্থান নিল কেন্দ্র সরকার গঠিত বোর্ড অব গভর্নরস।

আজ দেশের রাষ্ট্রপতি এক অর্ডিন্যান্স জারি করেন। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স নামক এই অধ্যাদেশের বলে আজই বাতিল হয়ে গেল নির্বাচিত মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া।

অধ্যাদেশের ধারা অনুযায়ী নতুন কাউন্সিল গড়ার আগে অবধি কাজ চালানোর জন্য এক বোর্ড অব গভর্নরস গঠন করেছে কেন্দ্র সরকার।

এই বোর্ডের প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন নিতি আয়োগের সদস্য ডা. বিনোদ কুমার পাল, যিনি আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের এক প্রধান প্রচারকও। সদস্য হিসেবে আছেন নয়া দিল্লির এইমস, চন্ডীগড়ের পিজিআইএমইআর, ব্যাঙ্গালোরের নিমহান্স-এর তিন অধিকর্তা এবং এইমসের এন্ডোক্রিনোলজির বিভাগীয় প্রধান। এক্স অফিসিও সদস্য দুইজন—দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অব হেলথ সার্ভিস এবং আইসিএমআর-এর ডিরেক্টর জেনারেল। এই বোর্ডকে সহায়তা করার জন্য বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন এক অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আমলা ডা. সঞ্জয় শ্রীবাস্তব।

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন, আয়ুষ্মান ভারত, ইত্যাদি বিতর্কিত বিষয় বাস্তবায়িত করার সময়ে নিজ পক্ষ মজবুত করার জন্য মেডিক্যাল কাউন্সিল বাতিল করল বিজেপি সরকার—এমনটাই বলছেন চিকিৎসক নেতারা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

হরেকরকম

ছারপোকা

ছারপোকা মারা খুব শক্ত। শিবরাম চক্রবর্তী একবার ছারপোকা মারা বিষ নিয়ে লিখেছিলেন, ছারপোকা গ্যারান্টি দিয়ে মারবে বটে, কেবল ছারপোকা ধরে তার মুখ হাঁ করিয়ে তার গলার মধ্যে বিষটা উপযুক্ত মাত্রায় ঢেলে দিলেই, ব্যস নিশ্চিন্ত।

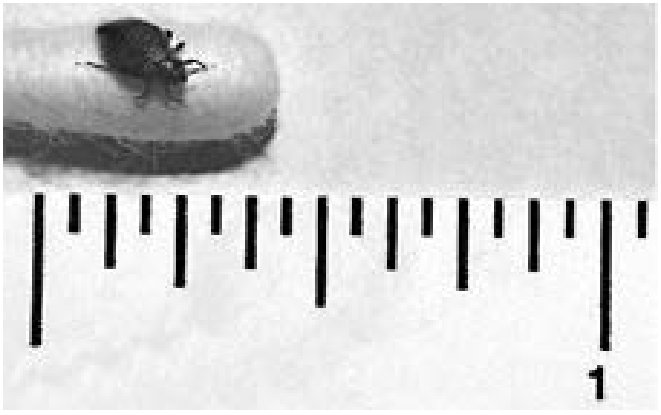

চিত্র ১. ছারপোকা—পাশে সেন্টিমিটার স্কেল

সেগুন কাঠের খাট হোক বা দড়ির খাটিয়া, বড়ো কোম্পানির গদি হোক বা শতচ্ছিন্ন শতরঞ্চি, পেয়ারা-বিচির সাইজের (০.৫ মিলিমিটার লম্বা) ছারপোকা তাড়াতে গিয়ে নাস্তানাবুদ সবাই।

ছারপোকা বিপজ্জনক কিছু নয়। মশার মতো কোনো রোগ ছড়ায়, তাও নয়। কিন্তু কামড়ালে খুব চুলকায়। কারও কারও আবার এই ছারপোকার কামড়ে অ্যালার্জি থাকে, তাঁদের চুলকানি অসম্ভব বেশি হয়।

ছারপোকা হয়েছে তা কেমন করে বুঝবেন?

যদি সকালে উঠে গা চুলকায় আর লাল-লাল দাগ দেখেন গায়ে, তাহলে আপনার তোশক-গদি-শতরঞ্চি দেখুন, দেখুন খাট বা খাটিয়ার কোনাগুলো। এরা খাট-খাটিয়া-তোশক-বিছানার ফাটাফুটোয় লুকিয়ে থাকে। যদি ছারপোকাদের নাও দেখতে পান, তোশকে ছোটো ছোটো কালো গুটুলি দেখতে পাচ্ছেন কি? ওটা ছারপোকার নাদি হতে পারে। আরও পেতে পারেন কালচে ছোটো ছোটো ছারপোকার খোলস, এরা বড়ো হবার সময় খোলস ছাড়ে কিনা। বিছানার চাদরে রক্তের ছোটো স্পট পেতে পারেন। আর পেতে পারেন একটা দুর্গন্ধ, যা অভিজ্ঞজন ছারপোকার গন্ধ হিসেবে সহজেই চিনতে পারেন।

কাঠের আসবাবে ছারপোকা হবার সম্ভাবনা প্লাস্টিক বা ধাতুর আসবাবের চাইতে অনেক বেশি। তবে অনেক সময় এরা বিছানা, সোফা ইত্যাদির থেকে অনেক দূরেও থাকতে পারে—আয়নার পেছনে কিংবা টেলিফোন বা কম্পিউটারের আনাচেকানাচে থাকলেও আশ্চর্য হবেন না।

ছারপোকার কামড়

লাল গোটা আর চুলকানি হয়। মুখ, ঘাড়, হাত এসব খোলা জায়গায় বেশি হয়—আমাদের দেশে গরমকালে প্রায় সবকিছু খুলে রাত্রে শুই আমরা, তাই প্রায় সর্বত্রই এরকম কামড়ের দাগ আর চুলকানি হতে পারে, তবু পিঠে আর হাতের বাইরের দিকে একটু বেশি হয়। যাঁদের বেশি প্রতিক্রিয়া হয়, যেমন ছোটো বাচ্চাদের, বা ছারপোকার কামড়ে অ্যালার্জি আছে যাঁদের, তাঁদের ছোটো ফোসকাও হতে পারে। সাধারণত কয়েকটা কামড়ের দাগ চামড়ার ওপর একটা সরলরেখা বরাবর দেখা যায়। চুলকে ফেললে ছাল উঠে জ্বালা করে, ও জীবাণু সংক্রমণ হয়ে পুঁজ জমতে পারে।

জীবাণু সংক্রমণ না হলে কামড়ের জ্বালা দ্রুত মিলিয়ে যায়, দাগ মেলাতে দু-তিন সপ্তাহ সময় লাগে। কমজোরি একটু স্টেরয়েড মলম আর মুখে খাবার অ্যালার্জিনাশক (অ্যান্টিহিস্টামিন) বড়ি দিয়ে এর চিকিৎসা করা যায়। জীবাণু সংক্রমণ হলে ডাক্তার দেখাতেই হবে।

কী করে ছারপোকার আগমন ঠেকাবেন?

ট্রেন-বাস থেকে নামার সময়ে আপনার ব্যাগের গায়ে, আপনার কাপড়ে, আপনার অতিথির কাপড়ে, আসবাবপত্রে ছারপোকা বিনা

নিমন্ত্রণে চলে আসে। আর এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যায় আস্তে আস্তে পায়ে হেঁটে, কিন্তু খুব নিশ্চিতভাবেই। সুতরাং আপনার ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস বাড়িতে ঢোকানোর আগে ভালো করে দেখে নিন। নরম কাপড়ের ব্যাগের বদলে শক্ত সুটকেস জাতীয় জিনিস অপেক্ষকৃত নিরাপদ। কাঠের বা বেতের আসবাবপত্র কিনলে, বিশেষ করে যদি পুরোনো কেনেন, তবে দেখে নিন ভালো করে। সেকেন্ড হ্যান্ড গদি, তোশক কিনবেন না।

মনে রাখবেন, ছারপোকা নোংরায় আলাদা করে আকৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু নোংরা থাকলে, বা একগাদা জিনিস ডাঁই করে পড়ে থাকলে, ছারপোকাদের সেটা ভারি পছন্দের নিরাপদ অভয়ারণ্য। সুতরাং বাড়ি আবর্জনামুক্ত রাখুন।

ছারপোকা তাড়াবেন কেমন করে?

সহজ কথা নয়। পেস্ট কন্ট্রোল করার বিজ্ঞাপন দেন যাঁরা, তাঁদের ডাকতে পারেন। তা নইলে শিবরাম চক্রবর্তীর পথ অবলম্বন করতে পারেন, কিন্তু দিনের মধ্যে আটচল্লিশ ঘণ্টা যদি ছারপোকার পেছনে ব্যয় করতে পারেন, তবেই।

ছারপোকা যেসব চাদর, জামাকাপড় ইত্যাদিতে লেগেছে সেগুলো গরম জলে (৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি উষ্ণতায়) ধুয়ে ফেলুন।

সমস্ত বিছানা, সোফা ইত্যাদি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করুন। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের ভেতরে জমা ময়লাটা এবার প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে সিল করে রাখুন।

খুব বেশি ছারপোকা হয়ে গেলে সেটা ফেলে দিন (দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো)। ফেলে দিতে না পারলে গোটা তোশকটা প্ল্যাস্টিক কভার দিয়ে নিশ্ছিদ্রভাবে মুড়ে ফেলুন।

তথ্যসূত্র: https://www.nhs.uk/conditions/bedbugs/ স্বাস্থ্যের বৃত্তে

টুকরো খবর

অ্যান্টিবায়োটিকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে সাবধান

শ্বাসতন্ত্র, মূত্রতন্ত্র এবং অন্ত্রের নানা জীবাণু সংক্রমণে বহুল ব্যবহৃত হয় ফ্লুরোকুইনোলন গোত্রের জীবাণুনাশকগুলো। এদের মধ্যে আছে সিপ্রোফ্লক্সাসিন, লিভোফ্লক্সাসিন, ওফ্লক্সাসিন, মক্সিফ্লক্সাসিন, নরফ্লক্সাসিন, ইত্যাদি।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা USFDA ওষুধগুলির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রোগীদের সচেতন করার জন্য কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। ভারতের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থাও একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা USFDA ওষুধগুলির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রোগীদের সচেতন করার জন্য কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। ভারতের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থাও একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। ২৩ অক্টোবর ২০১৮-এ লেখা এক নির্দেশে দেশের ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ড্রাগ কন্ট্রোলারদের ব্যবস্থা নিতে বলেছেন যাতে ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধের মোড়কে লেখে যে—এই ওষুধ ব্যবহারে ব্লাড সুগারের মাত্রা কমে যেতে পারে এবং এর ব্যবহারে মানসিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।

ওষুধের প্যাকেটের প্রোডাক্ট ইনফর্মেশনে এবং ওষুধের প্রচারসামগ্রীতে লেখা চাই যে, ফ্লুরোকুইনোলন ব্যবহারে ব্লাড সুগার কমতে পারে, যাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে, এ থেকে কোমা অর্থাৎ অচেতনতাও হতে পারে। ফ্লুরোকুইনোলন মুখে খেলে বা শিরা দিয়ে নিলে মানসিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যার মধ্যে রয়েছে—

- মনোযোগ দিতে অসুবিধা,
- নার্ভাসনেস,
- উত্তেজনা,
- স্থান কাল বোধ লোপ পাওয়া,
- মনে রাখতে পারায় অসুবিধা,
- ডেলিরিয়াম নামক গুরুতর মানসিক সমস্যা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

হরেকরকম

অনিচ্ছাকৃত ওজন হ্রাস

পরনের পাতলুন আঁটতে গিয়ে বেল্টের ব্যবহার করতে হচ্ছে ? অথবা পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজনের মুখে শুনতে হচ্ছে—"ইস্ শরীরটা পুরো ভেঙে গেছে।" হঠাৎ করে চোখে পড়ার মতো ওজন কমে যাওয়া অনেকসময়ই মানসিক চাপ হবার মতো ঘটনার পর হয়ে থাকে। যদিও কোনো কোনো বড়ো রোগের লক্ষণও অনেক সময় ওজন কমা দিয়ে শুরু হয়।

চাকরি পরিবর্তন, বিবাহ বিচ্ছেদ, স্বজনের মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা মানসিক চাপ ও বেদনার সৃষ্টি করে, ফলত এই সকল পরিস্থিতির মধ্যে থাকা ব্যক্তির ওজন হ্রাস স্বাভাবিক ব্যাপার। যখন সেই ব্যক্তি পুনরায় সুখী অনুভব করে, ওই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে শুরু করে তখন দেহের ওজনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। অনেক সময় চারপাশের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়পরিজনেদের সহমর্মিতা এবং কখনো কখনো মনোবিদের পরামর্শ লাগে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে।

অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা (ইচ্ছে করে খাওয়া কমিয়ে দেওয়া) এবং বুলিমিয়া (লোভে পড়ে একসাথে অনেক খেয়ে ফেলে মোটা হওয়ার ভয়ে খাওয়া কমিয়ে দেওয়া) নামক দু-ধরনের খাওয়ার ব্যাপারে মানসিক রোগ অনেক সময় তাৎপর্যপূর্ণ ওজন হ্রাসের কারণ।

যদি অতিরিক্ত ব্যায়াম, খাওয়া কমানো বা উপরিউক্ত অন্যান্য কারণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আপনার ওজন কমে যাচ্ছে বলে আপনার মনে হয়, তবে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন।

কতখানি ওজন কমা চিন্তার কারণ?

শরীরের ওজন সবসময় পরিবর্তন হতে থাকে, কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে কমা ওজন যদি ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে ৫%-এর বেশি হয় তবে তা উদ্‌বেগের কারণ। অতিরিক্ত ওজন হ্রাস অপুষ্টির লক্ষণ। ওজন কমার সাথে সাথে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি শরীরে উপস্থিত কিনা দেখতে হবে।

ক. ক্লান্তি

খ. খিদে কমে যাওয়া

গ. মলত্যাগের অভ্যাসের পরিবির্তন

ঘ. শরীরের অসুস্থভাব বা জীবাণু সংক্রমণ বেশি হওয়া।

অপ্রত্যাশিত ওজন হ্রাসের সাধারণ কারণসমূহ:

ওজন হ্রাসের সবসময় কোনো নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় এমনটা নয়। তবে উপরিল্লিখিত কারণ ছাড়াও নীচে বর্ণিত কারণগুলোও সাধারণত অপ্রত্যাশিত ওজন হ্রাস করে।

১. অবসাদগ্রস্ততা

২. শরীরে থাইরয়েড হরমোনের আধিক্য অতিক্রিয়াশীল থাইরয়েড গ্রন্থি (হাইপারথাইরয়েডিসম) কিংবা হাইপোথাইরয়েডিসম এ ওষুধের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে।

অপ্রত্যাশিত ওজন হ্রাসের অন্যান্য কারণসমূহ:

এছাড়াও

ক. মদ ও ড্রাগের নেশা

খ. কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

গ. হৃদ্‌পিণ্ড, বৃক্ক ও যকৃতের রোগে

ঘ. হরমোন ক্ষরণকারী গ্রন্থির সমস্যায় যেমন ডায়াবেটিস বা অ্যাডিসন্‌স রোগে

ঙ. প্রদাহজনিত দীর্ঘকালীন রোগে যেমন: রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, লুপাস নেফ্রাইটিস ইত্যাদি

চ. দাঁতের রোগে (নড়বড়ে দাঁত, মুখে ঘা ইত্যাদিতে খাবার চিবিয়ে খেতে সমস্যা হয়, ফলে খাবার হজম হয় না, অপুষ্টি দেখা দেয়)

ছ. যে সকল রোগে খাবার গিলতে সমস্যা বা ব্যথা হয়

জ. পরিপাকতন্ত্র ও খাদ্যনালির বিভিন্ন রোগ যেমন: পাকস্থলির আলসার, ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজ়িজ়, সিলিয়াক ডিসিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে

ঝ. জীবাণু, ভাইরাস বা পরজীবীর সংক্রমণে যেমম: যক্ষ্মা, এইডস ইত্যাদি রোগে

ঞ. ডিমেনশিয়া নামক নার্ভের রোগে (যেখানে রোগী তার খিদের অনুভূতি সঠিকভাবে ব্যক্ত বা অনুভব করতে পারে না।)

এইসব ক্ষেত্রে ওজন হ্রাস হতে পারে।

অপ্রত্যাশিত ওজনহ্রাস হতে থাকলে সঠিক সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কারণ অনুসন্ধান করে সেই কারণের চিকিৎসা করতে হবে। আর যদি আপনার মনে হয় যে আপনার খাবার বদভ্যাস আছে তাহলে কোনো মনোবিদ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

তথ্যসূত্র: https://www.nhs.uk/conditions/unintentional-weight-loss/ স্বাস্থ্যের বৃত্তে

চিঠি

পাঠকের পত্র: লেখক ও অন্য এক চিকিৎসকের উত্তর

হোমিয়োপ্যাথি: একটি আলোচনা লেখাটি বাস্তবে ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা-র লেখা, ভ্রান্তিবশত ডা. অর্ক বৈরাগ্যের নামে ছাপা হয়েছিল। হোমিয়োপ্যাথির সমর্থনে দুই পাঠকের (তুষার রায়, শংকর আড়া, পো: তমলুক ৭২১৬৩৬) পত্রটির জবাব দিতে কলম ধরেছেন ডা. পণ্ডা ও ডা. বৈরাগ্য দু-জনেই। মূল পত্রের মধ্যে ইটালিকসে ডা. বৈরাগ্য-এর উত্তর দেওয়া হল। তারপর ডা. পণ্ডা-র উত্তর আলাদা করে দেওয়া হল।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আমি আপনার পত্রিকা *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র একজন নিয়মিত পাঠক। সম্প্রতি ডা. অর্ক বৈরাগ্যের একটি লেখা 'হোমিয়োপ্যাথি: একটি আলোচনা' সপ্তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা পড়ে আমার কিছু বক্তব্য পাঠালাম। দয়া করে এটি প্রকাশ করে আপনার পাঠক বর্গের কাছে পৌঁছে দিলে বাধিত হব।

হোমিয়োপ্যাথি কি বিজ্ঞান?

ডায়াগনসিস মানে রোগের একটা নাম দেওয়া এবং রোগের কারণ হিসাবে কোনো একটা কিছু নির্দিষ্ট করা। হোমিয়োপ্যাথি রোগীর চিকিৎসা করে, শুধু রোগের নয়। একই রোগ বিভিন্ন রোগীতে বিভিন্ন লক্ষণ ফুটিয়ে তোলে; অবশ্য কিছু লক্ষণ সবার মধ্যে COMMON থাকে। এইসব COMMON লক্ষণগুলির সমষ্টিকে রোগের নাম দিয়ে সংক্ষেপিত করা হয়। হোমিয়োপ্যাথিতে এসব COMMON লক্ষণগুলি বা diagnostic symptom, গৌণ। মুখ্য হল রোগীর অন্যান্য লক্ষণগুলি যেগুলি রোগীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। সুতরাং diagnosis-এর প্রয়োজন হোমিয়োপ্যাথিতে অতি সামান্যই। এ প্রসঙ্গে লেখক উল্লেখ করেছেন "অনেক আলাদা আলাদা রোগ একইরকম লক্ষণ তৈরি করতে পারে"। এর উত্তরে বলি যদি সত্যই তাই হয় সেক্ষেত্রে Homoeo ঔষধ একই হবে, আলাদা আলাদা হবে না।

উত্তর: *হোমিয়োপ্যাথি বিজ্ঞান কিনা সে প্রশ্নের উত্তর কিন্তু পাওয়া গেল না। বিজ্ঞান কাকে বলব আর কাকে বলব না, তার একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। হোমিয়োপ্যাথি কিন্তু সেই সংজ্ঞা মেনে চলে না। হোমিয়োপ্যাথির ফলসিফিয়েবিলিটির কোনো উদাহরণ নেই। আসলে এই হোমিয়োপ্যাথির পিছনের যে দর্শন তা হল 'ভাইটালিজম' । সেই দর্শনে বস্তুতই ডায়াগনোসিস-এর বিশেষ প্রয়োজন নেই। কিন্তু ক্লদ বার্নার্ড অনেক আগেই ভাইটালিজমকে আধুনিক বিজ্ঞান থেকে বাদ দিয়ে গেছেন।*

12c শক্তির উপরে হোমিয়ো ঔষধে দ্রাব্যের অস্তিত্ব থাকে না, হোমিয়োপ্যাথির বিরুদ্ধে এ অভিযোগটি পুরানো। অতি লঘু দ্রবণে দ্রাব্য কী অবস্থায় থাকে— আণবিক, পারমাণবিক, আয়নিক বা অন্য কিছু তা পরীক্ষাগারে সরাসরি দেখার মতো যন্ত্রপাতি এখনও অপ্রতুল। এ সুযোগে কিছু মনগড়া তত্ত্ব দিয়ে হোমিয়ো ঔষধের কার্যকারিতা প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। Benveniste এবং hypothesis, সেরকম একটি, এ বিষয়ে হোমিয়োপ্যাথির কোনো সম্পর্ক নেই। তবে সব hypothesis-এর পক্ষে ও বিপক্ষে যেমন যুক্তি দেখানো হয়, Benveniste-র পক্ষে কিন্তু ফরাসি Virologist Nobel Laureate ডা. মন্টাগনিয়ার-এর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ আছে। সে যাই হোক পরীক্ষাগারে অতি লঘু দ্রবণে দ্রাব্যের অস্তিত্ব প্রমাণের কিছু কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা যে হয়নি তা নয়। বেশি পুরোনোগুলি বাদ দিয়ে সাম্প্রতিককালের কয়েকটি উল্লেখ এখানে দিলাম।

উত্তর: *When asked by Canada's CBC Marketplace program if his work was indeed a theoretical basis for homeopathy as homeopaths had claimed, Montagnier replied that one "cannot extrapolate it to the products used in homeopathy"—*

মন্টাগনিয়ার-এর এই উবাচ ই যথেষ্ট মনে হয় তার গবেষণা নিয়ে। সূত্র-উইকিপিডিয়া।

১. *Extreme Homoeopathic dilutions retain starting materials* by P. S. Chikramane, A.K Suresh, J.R. Bellare & S. GKane, Dept. Of Chem. Engg & Dept Of Bio-sc+Bio-Engg, IIT, Bombay, published in Homoeopathy (2010), vol-99, p 231-242.-এর Electron Microscope এবং তার সাথে coupled sophisticated detector দিয়ে দেখিয়েছেন ধাতু থেকে প্রস্তুত হোমিয়ো ওষুধের 30c এবং 200c শক্তির মধ্যে ধাতুর nanoparticles বিদ্যমান!!

২. *Thermoluminescence of ultra-high dilution of lithium choloride and sodium chloride* by Rey L., Physica A, vol-323 (2003), p67-74.

এক্স-রে এবং গামা-রে দিয়ে এ দু-টি ক্লোরাইড দ্রবণকে (12c-র উপরে) 77 ডিগ্রি k-এ irradiate করে ধীরে ধীরে room temp.-এ আনলে দ্রবণগুলি থেকে Licl & Nacl-এর Thermoluminescence দেখতে পাওয়া যায়।

৩. Comparative efficacy of pre-feeding, post-feeding and combined pre-and post-feeding of two micro doses of a potentized homoeopathic drug, Mercurius sol, in neliorating genotoxic effects produced by mercuric chloride in mice.—*Evidence Based Complementary and alternative Medicine*, vol-1, (2004), p 291- 300. By Datta, Biswas & Khuda-buksh.

ইঁদুরের মধ্যে Mercuric chloride-এর বিষক্রিয়ার উপশমে এরা হোমিয়োপ্যাথিক ঔষধ MercuriusSol-এর 30c এবং 200c প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন, ঔষধের কার্যকারিতা আছে এবং 200c-র একটু বেশি আছে। ঝাঁকুনি দিলে ঔষধের শক্তি বৃদ্ধি পায়!

এ ব্যাপারে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে তার আগে হোমিয়োপ্যাথিক ঔষধকে একেবারে নস্যাৎ করা মনে হয় ঠিক নয়।

এবারে বিশ্বাসের কথায় আসি। হোমিয়োপ্যাথিক তাবিজ-মাদুলি ইত্যাদির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের সংখ্যাটা ভারতীয় উপমহাদেশে বেশি, তার কারণ অশিক্ষা, কুসংস্কার, ইত্যাদি।

বিগত দু-শো বছরে সারা বিশ্বের যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি হোমিয়োপ্যাথি ব্যবহার করেছেন এবং অনেক প্রচারও করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিশ্বনেতা মহাত্মাগান্ধীসহ এগারোজন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, দু-জন U.K-এর প্রধানমন্ত্রী, এবং ফ্রান্স, জার্মানি, নরওয়ে, মেক্সিকো ও ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানগণ; ধর্মগুরুদের মধ্যে সাতজন পোপসহ বিশিষ্ট কয়েকজন ইহুদি, মুসলিম এবং হিন্দুগুরু; বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন Charles Darwin, Sir William Osler, August Bier ও Dr. Montagnier; ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন J.D. Rockfeller, Charles Kettering, Robert Bosch; নাম করা সাহিত্যিকদের মধ্যে আছেন Goethe, Chekov, Tennyson, Dickens, Tagore, Saratchandra; সংগীত-শিল্পীদের মধ্যে আছেন Beethoven, Chopin, Wagner; চিত্রশিল্পীদের মধ্যে Van Gogh, Picasso, Gaudi; এবং আরও আরও অনেকে । এঁদেরকে অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে আমার তো হাত-পা কাঁপবে।

উত্তর: *ভ্রান্ত যুক্তিকাঠামো। আমি চিকিৎসক, মানবদেহের গঠন আর শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া বুঝি। আমি উচ্চশিক্ষিত। তার মানে এই নয়, আমি জ্যোতির্বিজ্ঞান বুঝি, অর্থনীতি বুঝি। তাহলে কি আমি আবার অশিক্ষিত হয়ে গেলাম? ভুরিভুরি উদাহরণ আছে। আইজাক নিউটন ক্লাসিকাল মেকানিক্স-এর জনক, কিন্তু একটা বড়ো সময় উনি এলকেমি প্র্যাক্টিস করেছেন, পরশপাথর খুঁজে বেড়িয়েছেন। এপল কোম্পানির জনক স্টিভ জোব নিজের প্যানক্রিয়াস-এর ক্যান্সার চিকিৎসা বিকল্প পদ্ধতিতে করতে গিয়ে প্রাণটাই হারিয়েছেন। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে ফর্মাল প্রশিক্ষণই পাননি, এক্সপার্ট নন, তিনি কীভাবে সেই বিষয়ের প্রতিনিধি হতে পারেন? আপনি বলবেন, তাহলে আমি কি হোমিয়োপ্যাথি পড়েছি? আমি তো অ্যালোপ্যাথি পড়েছি, তাহলে হোমিয়োপ্যাথি নিয়েই বা বলছি কেন? উত্তর: আমি চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়েছি। যা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান আর রসায়ন দিয়ে পুষ্ট। আর হোমিয়োপ্যাথিও এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি। তাই এটি আমার লব্ধ জ্ঞানের আওতায় দিব্যি পড়ে।*

উইলিয়াম অসলার আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক। আপনি তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে এড়িয়ে গেছেন। আপনার কথা শুনে মনে হতে পারে উনি হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ খেতেন। কিন্তু ঘটনা তা নয়। উনি বলেছিলেন: "His (Hahnemann's) belief that over-treatment with drugs was one of the medical errors of the day has been hinted at, and it was always one of his favorite axioms that no one individual had done more good to the medical profession than Samuel Hahnemann, whose therapeutic methods had demonstrated that the natural tendency of diseases was toward recovery, provided that the patient was decently cared for, properly nurses, and not overdosed." প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত করতে উনি হ্যানিম্যান-এর চিকিৎসা দর্শনকে (ভাইটালিজমকে নয়, রুগী কেন্দ্রিক মানবিক চিকিৎসবোধকে) অনুসরণ করেছিলেন।

এবারে আসি অ্যালোপ্যাথি/আধুনিক চিকিৎসার ব্যাপারে। অ্যালোপ্যাথি নাকি হ্যানিম্যান সাহেবের বানানো। অ্যালো (Allo) কথাটিও হ্যানিম্যান-এর আগে ছিল এবং প্যাথিও তাই। আর

অ্যালোপ্যাথি নামটাও কোনো নিন্দাসূচক নাম নয় বরং যুক্তিসঙ্গত। ঔষধের ক্রিয়া এবং রোগের ক্রিয়ার পারস্পারিক সম্পর্ক আলোচনায় হ্যানিম্যান এ নামটি উল্লেখ করেন। ওষুধের ক্রিয়া আর রোগের ক্রিয়া সমান্তরাল হলে হোমিয়োপ্যাথিক, আর বিপরীত হলে অ্যান্টিপ্যাথিক, আর যদি ওষুধের ক্রিয়া এ দু-টির কোনোটাই না হয় তাকে অ্যালোপ্যাথিক বলা হয়। এর দিক সমান্তরাল নয় বিপরীত দিকও নয়, তাদের মাঝে অনেক দিকের যেকোনো একটি, যা 'Allo' prefix দিয়ে বোঝানো হয়। হ্যানিম্যান তার পূর্ববর্তী আড়াই হাজার বছর ধরে চালু চিকিৎসা ব্যবস্থাকে প্রায়শই Old school of medicine বলে উল্লেখ করতেন। যা হ্যানিম্যান সাহেবের পরে বর্তমান কাল পর্যন্ত চালু আছে এবং যার ফসল বর্তমানের নব্য (আধুনিক) চিকিৎসকবৃন্দ। আজকাল এই নব্য চিকিৎসকবৃন্দের একটি অংশের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেটা হল—যারা অতীত ভুলে (বা ভয়ে মুছে ফেলে) ১৯২৮-৩০ সাল (পেনিসিলিন আবিষ্কার) থেকে নিজেদের প্যাথিকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা হিসাবে জাহির করে। তাহলে তো স্বনাম Dr. B.C. Roy, Dr. N.R. Sarkar, Dr. R.G. Kar. প্রমুখদের তো হাতুড়ে বলতে হয়। আরও ৫০ বছর পরে যে সব আরও আধুনিক চিকিৎসকবৃন্দ আসবেন তারা তো এখনকার এই নব্য ডাক্তার বাবুদের হাতুড়ে বলবেন, এভাবে দেখলে তো পুরো প্যাথিটাই হাতুড়ে প্যাথি হয়ে যাবে।

উত্তর: *আরেকটি ভ্রান্ত যুক্তি। আপনি তথ্যসূত্র দিয়ে জানাতে পারবেন আপনি কোথায় পড়েছেন পেনিসিলিন আবিষ্কারকে মডার্ন মেডিসিনের সূচনা ধরা হয়? একদিনে এই মডার্ন মেডিসিন আকাশ থেকে পড়েনি। যখন থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে আধুনিক বিজ্ঞান প্রবেশ করেছে তখন থেকে তা একটু একটু করে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান হয়েছে। শ'য়ে শ'য়ে বিজ্ঞানী আর তাঁদের আবিষ্কার আছে এর পিছনে। হামফ্রে ডেভি, লিউইনহুক, লুই পাস্তর, উইলিয়াম হার্ভে, রেনে লেনেক, ক্লদ বার্নার্ড প্রমুখ। আশা করি আমার কথা শুনে এটুকু অন্তত আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আমি অতীত ভুলিনি। বস্তুত History of Medicine আমার অন্যতম পছন্দের বিষয়। শেষের দিকে আপনি দৃষ্টিকটুর পর্যায়ে অতি সরলীকরণ করেছেন। বিজ্ঞানের ছাত্ররা তাঁদের পূর্বজদের কখনো হাতুড়ে বা অন্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অশিক্ষিত মনে করে না। যিনি যে সময়ে কাজ করেছেন, সেই সময়ের নিরিখে তিনি সম্মানিত হন। নিউটনের সূত্র প্রয়োগ করে আপনার ফোনে জিপিএস চলে না। উবের-এর গাড়ি আসে না। আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতা প্রয়োজন হয়। তাই বলে নিউটন টেলি কমিউনিকেশন ফিজিক্সে হাতুড়ে হয়ে যান না।*

এবার বিভিন্ন দেশে হোমিয়োপ্যাথির কথায়। লেখক লিখেছেন বেশিরভাগ উন্নত দেশে হোমিয়োপ্যাথিকে সংকুচিত করা হচ্ছে। কথাটি একেবারে ঠিক। কোনো হোমিয়ো ওষুধ F.D.A ছাড়পত্র পায়নি, এটা ঠিক নয়। বেশিরভাগ উন্নত তথা ধনী দেশে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে কিছু অ্যালোপ্যাথ-মনস্ক মানুষজন এবং তাদের পিছনে থাকে বিরাট বিরাট আন্তর্জাতিক ওষুধ ব্যাপারীরা। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। এ ব্যাপারে হোমিয়োপ্যাথির একমাত্র দোষ হল—তার অস্বাভাবিক কম দাম, এবং কম প্রয়োজন, যার ফলে ব্যাবসা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা না বলে পারি না। প্রায়শই দেখি অ্যালোপ্যাথির এক একটি ওষুধ যখন বাজারে আসে মস্ত হইচই শুরু হয়, কিছুদিন যাবার পর যখন তার ক্ষতিকর দিকটা ধরা পড়ে তখন সেটাকে নিষিদ্ধ করা হয়। এর অর্থ হল খুব ভালো করে পরীক্ষানিরীক্ষা না করে ওষুধটিকে বাজারে ছাড়া হয়েছিল, সে কারণে বহু মানুষের যে ক্ষতি হয়ে গেল তার দায় কার? F.D.A.-এর, না অ্যালোপ্যাথদের? না অন্য কারও? এ ধরনের বহু ওষুধ এখন নিষিদ্ধ, এ পত্রিকার পূর্ববর্তী একটি সংখ্যায় তা প্রকাশিত।

উত্তর: *Worldwide, over 200 million people use homeopathy on a regular basis.—সূত্র: HRI (homeopathy research institute).*

"The Indian Homoeopathy market is growing much faster than the global market, which is pegged around Rs 26,000 crore," Mukesh Batra, Chairman, Dr Batra's Positive Health Clinic said. আপনি কি যেন বলছিলেন? হোমিয়োপ্যাথি ওষুধের দাম কম তাই ব্যাবসা করা যায় না? এই ড. বাত্রা, স্বর্গীয় পি ব্যানার্জি এঁদের ফিজ় অনেক অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারকেও লজ্জা দেবে, জানেন তো?

২০০ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে যাঁদের ক্যান্সার আছে, যাঁরা হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা করান ক্যান্সারের জন্যে, তাদের ক্যান্সার আরও ছড়িয়ে গিয়ে অসুখ জটিল হওয়ার পিছনে দায় কার? FDA যদি মার্কেট সার্ভেতে দেখে কোনো ওষুধের লং টার্ম সাইড এফেক্ট আছে, তাহলে সেই ওষুধ তুলে নেওয়াটাই তো যুক্তি সম্মত এবং প্রশংসনীয়। বাজারে ছাড়ার আগে আপনি লং টার্ম সাইড এফেক্ট জানবেনই বা কীভাবে? সাইড এফেক্ট জানার পর বিজ্ঞানীরা হাত গুটিয়ে বসে থাকেন না সেটাকে এড়াতে আরও গবেষণায় নিমগ্ন হন? আজ অবধি হোমিয়োপ্যাথির কোনো জার্নালে বেড়িয়েছে যেখানে স্বীকার করা হয়েছে হোমিয়োপ্যাথি করতে গিয়ে ক্যান্সার আরও ছড়িয়ে যেতে পারে, এটা করা থেকে বিরত থাকুন?

এবারে আসি পরের অনুচ্ছেদে। হোমিয়ো ওষুধ যে Placebo Effect বা Moon Shine Effect এটা শুধুমাত্র রটনা, প্রমাণিত নয়। এর পক্ষে ও বিপক্ষে বহু গবেষণা আছে। সবগুলি বিচার করলে কিছুই প্রমাণিত হয় না। এ সম্পর্কে ২০০২ সালের একটি Survey-র উল্লেখ করলাম। Is it possible to move toward a consensus on homoeopathy?—R.Sturgess; *Pharmaceutical Journal* vol. 269 (2002), p. 138।

উত্তর: *আজকের সময়ে দাঁড়িয়েও যিনি প্লাসিব এফেক্টকে অস্বীকার করেন তিনি বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারা থেকে শতহস্ত দূরে। হোমিয়োপ্যাথি ছেড়ে দিন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্লাসিব এফেক্ট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।*

এর পরে আসছি আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার ডাক্তারও হোমিয়ো করেন। লেখকের মতে এঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাবিজ-মাদুলির সমর্থক! লেখক ভালোই জানেন হোমিয়োপ্যাথি একজন অ্যালোপ্যাথের মস্তিষ্ক-প্রসূত। ভারতের মাটিতে প্রথম যিনি কার্যকরীভাবে হোমিয়োপ্যাথির প্রসারে সচেষ্ট হন তিনি ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার, একজন বিশিষ্ট অ্যালোপ্যাথ, কলকাতার দ্বিতীয় M.D.,তখনকার সময়ে বিজ্ঞান-চেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিবেদিত-প্রাণ, ভারতের প্রথম ও প্রাচীন বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র Indian Association For Cultivation of Science-এর প্রতিষ্ঠাতা। এ তো গেল ইতিহাস। বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়ে অগণিত অ্যালোপ্যাথ (এরা সবাই কুসংস্কারচ্ছন্ন বা মাদুলি/ তাবিজের সমর্থক নয়) হোমিয়ো করেন। বাইরের অনেক দেশে অ্যালোপ্যাথির ডিগ্রির পরে P.G. diploma হিসাবে Homoeopathy পড়ানো হয়। শেষে উল্লেখ করছি Nobel Laureate Dr. Montagnier-এর নাম।

উত্তর: *মন্টাগনিয়ার নিয়ে আগেই যা বলার বলেছি। যেটুকু যোগ করব তা হল, এক্সপার্ট ওপিনিয়ন "level of evidence"-এর পিরামিড এ অনেক নীচে আসে। বর্তমানে এভিডেন্স বেসড মেডিসিনের যুগে কোন বড়ো ডাক্তার কী বললেন তার গুরুত্ব নিতান্তই কম। পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, স্ট্যাটিস্টিক্স, মেটা অ্যানালাইসিস এগুলোই একমাত্র প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। আর মহেন্দ্রলাল সরকার-এর হোমিয়োপ্যাথি চর্চা শুধুমাত্র বিজ্ঞান/সত্যান্বেষণ-এর জায়গা থেকে ছিল না, ব্রিটিশ তথা পাশ্চাত্য বিরোধী একটি স্বদেশি অনুপ্রেরণাও কাজ করেছিল এর পিছনে, সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষপটকে অস্বীকার করলে চলবে না।*

আয়ুশ সম্পর্কে লেখকের ধারণা তার নিজস্ব। আমার ধারণা ভিন্ন। ভারত সরকার যদি আয়ুশের পেছনে অ্যালোপ্যাথির বাজেটের সিকিভাগ বরাদ্দ করেন ফল অনেক ভালো হবে।

হোমিয়োপ্যাথির এফেক্টও নাই, আর সাইড এফেক্টও নাই এটা রটিয়ে অ্যালোপ্যাথির side effect-কে ঢাকা দেওয়া যাবে না। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের side effect থেকে মানুষের মৃত্যুর কারণ এখন বিশ্বে তৃতীয়, Cancer এবং Heart Disease-এর পরে। এ প্রসঙ্গে দু-টি কাজের উল্লেখ করলাম।

১. Lajarou j, Pomeranz B.H., Corey P.N (1998)—*Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients, a meta-analysis of prospective studies*, JAMA (1998), apr, 15, vol-279, p. 1200-5.

২. Null G., Dean C, Feldman M, Rasio D, (2005)—*Death by medicine, J. of Orthomolecular Medicine* (2005).

পুনরায় আপনি পাঠককে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন।

আমেরিকাতে চিকিৎসা ব্যবস্থার ত্রুটির (medical error) জন্যে মৃত্যুর কারণ আমেরিকাতে তৃতীয়। তা গোটা পৃথিবীর ছবি নয়। নিদারুণ সত্যি হল, ভারতে সমস্ত মৃত্যুর কারণে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ডায়রিয়া। ভাবুন একবার।

আর মেডিক্যাল এরর আর ওষুধের সাইড এফেক্ট দু-টিকে গোলাবেন না। ওষুধের সাইড এফেক্ট ছাড়াও আরও অনেক কারণে মেডিক্যাল এরর হয়। তাতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর দায় থাকে অনেক বেশি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নয়। খাঁটি সরিষার তেলে ভেজাল পাওয়া গেলে দোষটা সরিষার তেলের নয়, দোকানদারের।

'তবু কাজ তো হয়'—সত্যই কাজ হয়, তাকে আপনার placebo effect বলুন বা অন্য কিছু। যে সব অসুখ এমনিতেই সারবে যেমন সর্দি-কাশি (লেখকের মতে) সেখানেও তো অ্যালোপ্যাথরা prescribe করেন, হোমিয়োপ্যাথরা হয়তো না জেনে করেন। না বুঝে চিকিৎসা করে রোগকে বাড়িয়ে দেওয়া দু-প্যাথির ডাক্তারই করেন। এদের বেশিরভাগ স্বল্প শিক্ষিত বা সদ্য পাশকরা অনভিজ্ঞ।

এবার আসি শেষের অনুছেদে । লেখক অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ কীভাবে চালু হয়, তার পদ্ধতির কথা বলেছেন। হোমিয়ো ওষুধের বেলায় তার নিয়ম পদ্ধতি আছে, যেটা Homoeo Phamacopoea মেনে প্রথমে প্রস্তুত করে, তার পরের ধাপে সুস্থ মানব দেহে Proving করে, ওষুধের কার্যকারিতা নিরুপণ করা হয়। হোমিয়োপ্যাথি পরিবর্তন-বিমুখ এ অপবাদ ঠিক নয়। হোমিয়োপ্যাথির পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে একটি নীতির উপর—Similia Similibus Curentur। এ নীতি হ্যানিম্যানের আগে বহু বছর ধরে অনেকেই জানতেন। Hipocrates, Paracelsus-এর লেখাতেও এর উল্লেখ আছে। হ্যানিম্যান কেবল বহু পরীক্ষানিরীক্ষা (যার একটি লেখকের উল্লেখিত Cinchona Bark-এর পরীক্ষা) করে এটাকে একটি Law হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং প্রয়োগের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং এ Law বহু প্রাচীন, নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র বা গতিসূত্রের মতো। এদের দৈনন্দিন পরিবর্তন হয় না। যেমন বহু দিন পরে নিউটনের গতিসুত্রের পরিবর্ধন করে Relativistic Mechanics এসেছে। কিন্তু সেও আবার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অতি নগণ্য ভূমিকা পালন করে। হ্যানিম্যান নিজে একশোর কাছাকাছি ওষুধ দিয়ে গিয়েছেন, এখন যার সংখ্যা পাঁচ হাজারের কাছাকাছি। তত্ত্বের ক্ষেত্রে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখন বহু গবেষণা চলছে। সারা বিশ্বে এখন আড়াইশোর বেশি গবেষণা-পত্রিকা চালু আছে। যার অনেকগুলি অনেকদিন ধরে চালু এবং বেশ উচ্চমানের (Impact factor 1.2~1.5)।

পরিশেষে বলি যারা অন্ধ-বিরোধী তাদের বাদ দিয়ে যারা যুক্তি দিয়ে বিরোধিতা করেন তাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য হোমিয়ো ওষুধকে তিনটি পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।

প্রথম এবং প্রধান Clinic: হোমিয়ো ওষুধে রোগ কি সারে? এ ব্যাপারে বহু ডাক্তার এবং রোগী এবং বহু গুণীজনের সমর্থন বা ভুয়োদর্শন ফলে অতীব সন্তোষজনক। এমনকী বিরোধীরাও না করতে পারে না, যদিও একে placebo effect বলে চালায়।

দ্বিতীয় Laboratory: হোমিয়ো ওষুধে 12c শক্তির উপরে কি ওষুধের অস্তিত্ব পাওয়া যায়? এ ব্যাপারে যে সব সরাসরি পরীক্ষা হয়েছে তাদের ফলাফল নিশ্চয়ই আশাব্যঞ্জক যদিও যথেষ্ট নয়।

তৃতীয় Theory: পরীক্ষাগারে পেলেও 12c শক্তির উপরে ওষুধের অস্তিত্ব classical chemistry (Avogadro's Law) দিয়ে তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করা যায় না। যেমন, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আলফা-কণা, আলফা-অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াস-এর বাইরে আপনা হতেই বেরিয়ে আসে তার ব্যাখ্যা classical physics দিয়ে পাওয়া যেত না, যদিও পরীক্ষাগারে সহজেই দেখানো যেত। George Gammoow প্রথম Quantum physics প্রয়োগ করে (Barrier Penetration Theory) আলফা decay-র সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হোমিয়ো ওষুধের বেলায় ওই Quantum Chemistry-র প্রয়োগ করে ওষুধের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে অদূর ভবিষ্যতে। এ ব্যাপারে কিছু কিছু কাজও আরম্ভ হয়েছে। আমি এখানে দু-টির উল্লেখ করলাম।

১. Energy and Electron Transport in Biological Systems by A.S. Davydov, *Bio-electro dynamics and Bio-communications*, World Scientific Publishing Co. Pvt. Ltd, 1994, Singapore, chapter-17, p. 411-430.

২. H. Walach, W. BJonas, J. lves, R. Van Wijike & O. Weingatner, *Research on Homoeopathy: state of the art, Journal of alternative Complement. Med*, vol-2(2005), p. 813-829.

উত্তর: *আমার তরফ থেকেও শেষ কয়েকটি কথা। দু-শো বছর অতিক্রান্ত হোমিয়োপ্যাথির। এই দু-শো বছরে আধুনিক বিজ্ঞানের যখন যে শাখায় কালজয়ী গবেষণা তথা আবিষ্কার হয়েছে, হোমিয়োপ্যাথির প্রবক্তারা চেয়েছেন তার সাথে হোমিয়োপ্যাথিকে জুড়ে দিয়ে তার একটা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চেহারা দেওয়ার, যাতে তার গ্রাহ্যতা বাড়ে। সেটা কখনো Resonance, কখনো molecular memory। এখন নতুন হল কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি, কোয়ান্টাম এনটানগল্মেন্ট। এতে করে হোমিয়োপ্যাথি কতটা বিজ্ঞান তা প্রমাণ হোক বা না হোক, প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানের যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য—'সংশয়বাদ' তার থেকে যে হোমিয়ো-প্যাথি এখনও শতহস্ত দূরে তা নিয়ে আমি সংশয়হীন।*

চিঠিটির সামগ্রিক উত্তর দিচ্ছেন ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা—

১. হোমিয়ো ওষুধের কার্যকারিতা প্রমাণ না হওয়ার পেছনে যদি যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা বা বিজ্ঞানের ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়, তাহলে সেই একই যুক্তিতে পাথর বা তাবিজকেও অপ্রমাণিত বিজ্ঞান মানতে হয়। একথা অনস্বীকার্য, অসংখ্য মানুষ পাথর বা তাবিজ ধারণে উপকার পেয়েছেন বলে দাবি করেন।

প্রচলিত বিজ্ঞানের বাইরে কোনো চমকপ্রদ দাবি পেশ করতে গেলে তার পেছনে যথোপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরই দায়িত্ব। তাকে 'বিজ্ঞানের ব্যর্থতা' বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হাস্যকর।

২. কোনো ওষুধ বাজারে আসার জন্য অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করে আসতে হয়। পপুলেশনে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব যদি আশাব্যঞ্জক না হয় তবে সেই ওষুধ বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়। বিজ্ঞানের নিয়মই তাই, প্রতিনিয়ত যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে নিজেকে শুদ্ধ করা। যেকোনো পর্যায়ে অযৌক্তিক মনে হলে তাকে বর্জন করাই বিজ্ঞান। 'অপরিবর্তনীয় মানেই ভালো'—এ জাতীয় ধারণা মূলত গোঁড়ামি।

ওষুধ পরীক্ষানিরীক্ষার সময়কার ক্ষতির হিসেব মাথায় রেখেই নতুন ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নইলে তো ওষুধ-বিজ্ঞানের চলার পথই বন্ধ করে দিতে হয়।

শুধু মেডিসিন নয়, পৃথিবীতে যেকোনো জয় অনেক রক্ত-ঘামের বিনিময়ে আসে। উত্তরসূরিরা অবশ্যই সেই রক্ত-ঘামের মূল্য অস্বীকার করবেন না কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাঁরা নতুন কিছু করতে পিছ-পা হবেন।

৩. আজ পর্যন্ত রোগের বিরুদ্ধে মানুষের নিরন্তর লড়াইতে যে ক-টি অস্ত্র সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ভ্যাকসিন বা টিকা। অথচ হোমিয়োপ্যাথরা এই ভ্যাকসিনের বিরোধিতা করে এসেছেন

> ইতিহাসের ছাত্রের কাছে হোমিয়োপ্যাথির মূল্য থাকতে পারে, বিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে না।

আগাগোড়া। অজস্র যুগান্তকারী মেডিক্যাল ইনভেস্টিগেশনের কোনো জায়গায় হোমিয়োপ্যাথির কোনো অবদান নেই। 'বিশ্ব-স্বীকৃত বা নোবেলজয়ী হোমিয়ো বিজ্ঞানী' মূলত সোনার পাথরবাটি।

অসংখ্য হোমিয়ো-ডাক্তারের মডার্ন মেডিসিনে হাতুড়ে প্র্যাপকটিস কিংবা হোমিয়ো পুরিয়ার মধ্যে মেডিসিন ভরে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অনেকবার। যদিও এর দায় হোমিয়ো সিস্টেমের নয় তবুও একটা সিস্টেমের এত সংখ্যক মানুষের যুগপৎ অবিমৃষ্যকারিতা সিস্টেমটির কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দেবে সেটাই স্বাভাবিক।

৪. মূল নিবন্ধেই বলা ছিল: কারো ব্যক্তিগত কুসংস্কারের দায় বিজ্ঞানের নয়। প্রচুর চিকিৎসক বা আপাত-বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ পাথর ধারণ করেন। 'আইনস্টাইন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন অতএব ঈশ্বর আছেন'—এ জাতীয় যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল। উল্লেখ্য যে, লেভেল অফ এভিডেন্সের সবচেয়ে নীচের ধাপে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন থাকে। অর্থাৎ, একজন মানুষ যত বড়ো বিজ্ঞানীই হন না কেন তাঁর প্রমাণবিহীন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত 'মনে হওয়া'-কে বিজ্ঞান বিশেষ গুরুত্ব দেয় না।

৫. আগেই বলা হয়েছে, হোমিয়োপ্যাথির ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চই আছে। মেডিক্যাল কলেজগুলোর লাইব্রেরিতেও প্রচুর পুরোনো দিনের মূল্যবান বইপত্র রাখা থাকে যার ঐতিহাসিক বা আবেগগত মূল্য অপরিসীম কিন্তু সেগুলো পড়ে বর্তমানের ডাক্তারি পড়ুয়ারা ডাক্তারি করবে না সেটাই স্বাভাবিক কারণ বিজ্ঞান আবেগে চলে না। ইতিহাসের ছাত্রের কাছে হোমিয়োপ্যাথির মূল্য থাকতে পারে, বিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

সবার জন্য স্বাস্থ্য

মানে

দেশের সমস্ত মানুষ তাঁদের দরকার মতো ভালো মানের পরিষেবা পাবেন, স্বাস্থ্যের ঝুঁকি থেকে বাঁচতে পারবেন, অসুখ হলে তাঁদের আর্থিক দুর্গতিতে পড়তে হবে না, সরকার নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেবে।

সরকারি একাধিক কমিটি হিসেব করে দেখিয়েছে এমনটা সম্ভব—যদি সরকার মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ২.৫% স্বাস্থ্যখাতে খরচ করে।